শুকতারা

মৃত্যুদূতের কালোছায়া

ঊনচত্বারিংশৎ বর্ষ
একাদশ সংখ্যা
পৌষ ১৩৯৩

পত্রিকাটি ধুলোখেলায় প্রকাশের জন্য

হার্ড কপি ঃ সুজিৎ কুণ্ডু

স্ক্যান ঃ শুভঙ্কর ঘোড়ুই

এডিট ঃ হরিদাস পাল

একটি আবেদন

আপনাদের কাছে যদি এরকমই কোনো পুরানো আকর্ষণীয় পত্রিকা থাকে এবং আপনিও যদি আমাদের মতো এই মহান অভিযানের শরীক হতে চান, অনুগ্রহ করে নিচে দেওয়া ই -মেইল মারফত যোগাযোগ করুন।

e-mail: optifmcybertron@gmail.com; dhulokhela@gmail.com

আপনার চুলের স্টাইল যেমনই হোক না কেন
কেয়ো-কার্পিনে আপনাকে দারুণ স্মার্ট দেখাবে!
চুলের স্টাইল যাই হোক না কেন, তার সর্বাঙ্গীন যত্নের জন্যে প্রতিদিন ব্যবহার করুন মৃদু সুরভিত কেয়ো-কার্পিন হেয়ার অয়েল।
চুলের পুষ্টি যোগাবে। চুল থাকবে সুন্দর, স্বাস্থ্যোজ্জ্বল—অথচ তেলমাখা চটচটে ভাবটি থাকবে না।
আর সেইজন্যেই আপনি স্টাইল পাল্টে পাল্টে দেখতেও পারবেন, কোন স্টাইল আপনাকে সব থেকে বেশি ভালো লাগে।
১০০ মি·লি ও ৩০০ মি·লি শিশিতে পাওয়া যায়।
কেয়ো-কার্পিন
সুগন্ধী হেয়ার অয়েল।
চুল চটচটে করে না।
A HAIR OIL OF DISTINCTION
সুস্থ চুল। সুন্দর চুল।
কেয়ো-কার্পিন চুল।
Dey's
যাদের যত্নই আপনার আস্থ

বাঁটুল দি গ্রেট

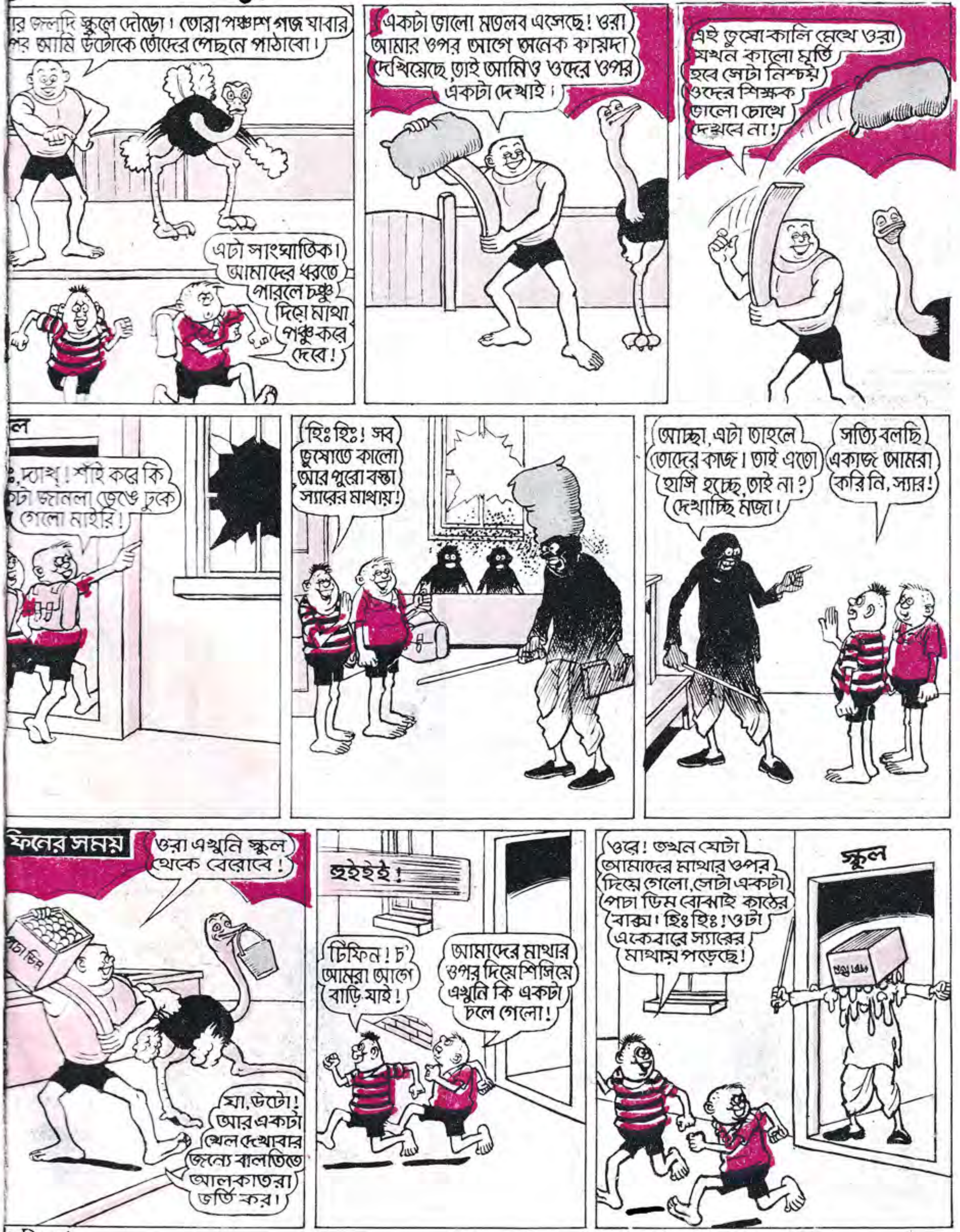

...ার জলদি স্কুলে দৌড়ো। তোরা পঞ্চাশ গজ যাবার
...র আমি উটোকে তোদের পেছনে পাঠাবো।
এটা সাংঘাতিক। আমাদের ধরতে পারলে চঞ্চু দিয়ে মাথা পাঙ্কু করে দেবে!
একটা ভালো মতলব এসেছে! ওরা আমার ওপর আগে অনেক কায়দা দেখিয়েছে, তাই আমিও ওদের ওপর একটা দেখাই।
এই ভুষো কালি মেখে ওরা যখন কালো মূর্তি হবে সেটা নিশ্চয় ওদের শিক্ষক ভালো চোখে দেখবে না!
ল
ঃ, দ্যাখ্! শাঁই করে কি ...টা জানলা ভেঙে ঢুকে ... গেলো মাইরি!
হিঃ হিঃ! সব ভুষোতে কালো আর পুরো বস্তা স্যারের মাথায়!
আচ্ছা, এটা তাহলে তোদের কাজ। তাই এতো হাসি হচ্ছে, তাই না? দেখাচ্ছি মজা।
সত্যি বলছি একাজ আমরা করি নি, স্যার!
...ফিনের সময়
ওরা এখুনি স্কুল থেকে বেরোবে!
পচা ডিম
যা, উটো! আর একটা খেল দেখাবার জন্যে বালতিতে আলকাতরা ভর্তি কর।
হুইইই!
টিফিন! চ' আমরা আগে বাড়ি যাই!
আমাদের মাথার ওপর দিয়ে শিসিয়ে এখুনি কি একটা চলে গেলো!
স্কুল
ওরে! তখন যেটা আমাদের মাথার ওপর দিয়ে গেলো, সেটা একটা পচা ডিম বোঝাই কাঠের বাক্স। হিঃ হিঃ! ওটা একেবারে স্যারের মাথায় পড়েছে!

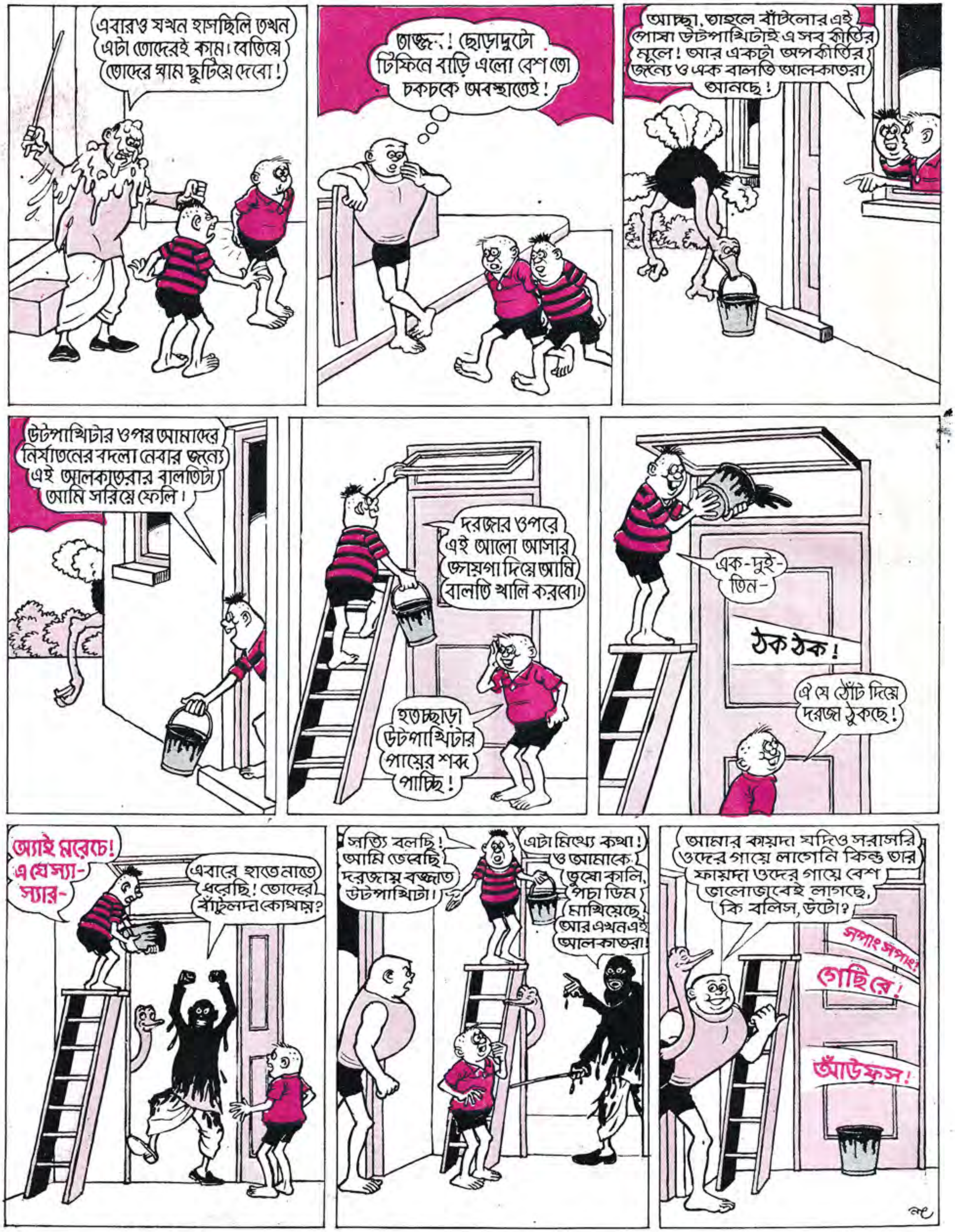

এবারও যখন হাসছিলি তখন এটা তোদেরই কাম। বেতিয়ে তোদের ঘাম ছুটিয়ে দেবো!
তাজ্জব! ছোড়াদুটো টিফিনে বাড়ি এলো বেশ তো চকচকে অবস্থাতেই!
আচ্ছা, তাহলে বাঁটলোর এই পোষা উটপাখিটাই এ সব কীর্তির মূলে! আর একটা অপকীর্তির জন্যে ও এক বালতি আলকাতরা আনছে!
উটপাখিটার ওপর আমাদের নির্যাতনের বদলা নেবার জন্যে এই আলকাতরার বালতিটা আমি সরিয়ে ফেলি।
দরজার ওপরে এই আলো আসার জায়গা দিয়ে আমি বালতি খালি করবো।
হতচ্ছাড়া উটপাখিটার পায়ের শব্দ পাচ্ছি!
এক-দুই-তিন-
ঠক ঠক!
ঐ যে ঠোঁট দিয়ে দরজা ঠুকছে!
অ্যাই মরেচে! এ যে স্যা-স্যার-
এবারে হাতে নাতে ধরেছি! তোদের বাঁটুলদা কোথায়?
সত্যি বলছি! আমি ভেবেছি দরজায় বজ্জাত উটপাখিটা।
এটা মিথ্যে কথা! ও আমাকে ভুষো কালি, পচা ডিম মাখিয়েছে, আর এখন এই আলকাতরা!
আমার কায়দা যদিও সরাসরি ওদের গায়ে লাগেনি কিন্তু তার ফায়দা ওদের গায়ে বেশ ভালোভাবেই লাগছে, কি বলিস, উটো?
সপাং সপাং!
গেছি রে!
আঁউফ্‌স!

বাংলা ভাষায় সর্বাধিক প্রচারিত ছোটদের মাসিক পত্রিকা

শুকতারা

পৌষ ১৩৯৩

APPROVED BY THE DIRECTORATE OF PUBLIC INSTRUCTION, WEST BENGAL AS
CHILDREN'S MONTHLY MAGAZINE VIDE MEMO NO. 538 (17) 1 (9) T.B.C. (dated 21.7.86)

সূচীপত্র

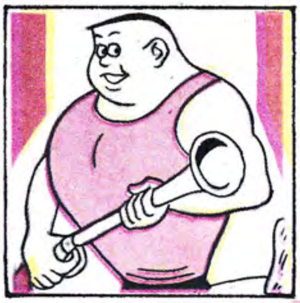

১। মৃত্যুদূতের কালোছায়া (ছবিতে গল্প) —নারায়ণ দেবনাথ প্রচ্ছদ
২। বাঁটুল দি গ্রেট (রঙিন ছবিতে গল্প) —নারায়ণ দেবনাথ ১৬১
৩। ম্যাজিক (কবিতা)—নিখিল তরফদার ১৬৫
৪। বৃশ্চিকের পদক্ষেপ (গোয়েন্দা গল্প রঙিন ছবিতে)—ইন্দ্রনীল ঘোষ ১৬৬
৫। সুধাংশু নন্দী (অগ্নিযুগের সৈনিক) —সুধীন্দ্রনাথ রাহা ১৬৮
৬। কর্মই ধর্ম (গল্প) —অপর্ণা মুখোপাধ্যায় ১৭৩
৭। যাদের দেখা যায় না (ভূতের গল্প) —আশা দেবী ১৭৭
৮। অভিশপ্ত সিন্দুক (গোয়েন্দা গল্প) —রাধারমণ রায় ১৮০
৯। ছবির মজা—সুফি ১৮৩
১০। একটি কামধেনুর জন্য (পৌরাণিক কাহিনী) —দোলগোবিন্দ মুখোপাধ্যায় ১৮৪
১১। স্টার ট্রেক (ছবিতে কল্প-বিজ্ঞানের গল্প) —রন হ্যারিস ও শ্যারমান ডিভোনো ১৮৮
১২। যাদুর দেশে টারজান (অ্যাডভেঞ্চার) —সব্যসাচী ১৯০
১৩। খেলাধূলা—শান্তিপ্রিয় বন্দ্যোপাধ্যায় ১৯৫
১৪। ব্রুস লি (ছবিতে গল্প) —ডিভোনো ও ম্যাটেরা ২০৬
১৫। গতিশীল মহাদেশ (বিজ্ঞানের গল্প) —সুনীত রায় ২০৮
১৬। অমৃতের পুত্র (সত্য ঘটনা)—নন্দলাল ভট্টাচার্য ২১৩
১৭। রূপোর নদী (ধারাবাহিক উপন্যাস) —অনিল ভৌমিক ২১৯
১৮। শ্রদ্ধা (প্রথম পুরস্কারপ্রাপ্ত গল্প) —দীপায়ন বিশ্বাস ২২৪
১৯। পিতৃভক্তি (দ্বিতীয় পুরস্কারপ্রাপ্ত গল্প) —বেবী চৌধুরী ২২৫
২০। প্রণামী বসু স্মৃতি সাহিত্য প্রতিযোগিতা (ঘোষণা) ২২৬
২১। মজার পাতা (ধাঁধা ইত্যাদি) ২২৭
২২। ছবির মজা—মানব বন্দ্যোপাধ্যায় ২২৯
২৩। হাঁদা-ভোঁদা (ছবিতে মজার গল্প) —নারায়ণ দেবনাথ ২৩০
২৪। দাদুমণির চিঠি ২৩২
২৫। তোমাদের পাতা ২৩৪
২৬। অঙ্ক জগতের জাদু (ম্যাজিক) —জাদুকর পি.সি.সরকার (জুনিয়র) ২৩৬
২৭। আফ্রিকার জঙ্গলে (ভ্রমণ-কাহিনী) —অমিয়কুমার হাটি ২৩৭
২৮। মাসের নাম জানুয়ারি (ফিচার)-আরতি বসু ২৪০

বার্ষিক গ্রাহক মূল্য—হাতে নিলে ৫৩ টাকা। ডাকে নিলে ৬৫ টাকা। প্রতি সংখ্যা—টাঃ ৩.৫০

Trikaya-E-3-86-BEN

মেজাজ খারাপ বাব্লু সোনার
খেলা ছাড়া চলে না তার
কিন্তু, রোগের ছোঁয়াচ লাগে পাছে
সঙ্গীসাথী আসে না কাছে!

এমন সময় একো এলো
সাঁই ঝপাঝপ্ এঁকে চললো
১২-রঙে দেখা দিল ময়ূর,কুকুরছানা
বাব্লু আহ্লাদে আটখানা!

হলদে,কমলা, বেগুনী, কালো
গোলাপী, ভায়োলেট, খয়েরী,লাল ও
সবুজ, নীল—সব রঙ চাও
তো সেরা স্কেচ পেন একো-ই নাও!

একো
স্কেচ পেন সদা রঙীন সাথী! করে রঙ্গে মাতামাতি!

প্রিসিশন্ রাইটিং পয়েন্টস্ প্রাঃ লিঃ, ১৮, সুভাষ রোড, ভিলে পার্লে (পূর্ব) বম্বে-৪০০ ০৫৭ ফোন : ৬০৪০৩০৫, ৬০৪৩৫৫৬

শুকতারা

৩৯শ বর্ষ ■ ১১শ সংখ্যা ■ পৌষ, ১৩৯৩/ডিসেম্বর ১৯৮৬

ম্যাজিক

নিখিল তরফদার

আমার কাছে
একটা আছে
ছোট্ট ম্যাজিক যন্ত্র,
মজার খেলা
দেখবি মেলা
দিলেই এতে মন্ত্র।
গিল্ গিল্ কা
এবার তাকা
দেখলি নিজের মুখ তো?
বললি ব্যাটা
আয়না এটা?
আচ্ছা বুরবুক তো!
তুই যা চেতিস
দেখতে পেতিস
কিন্তু কপাল মন্দ,
বেশি বোঝার
জন্য মজার
খেলা দেখাই বন্ধ।

ছবি : সরোজ সরকার

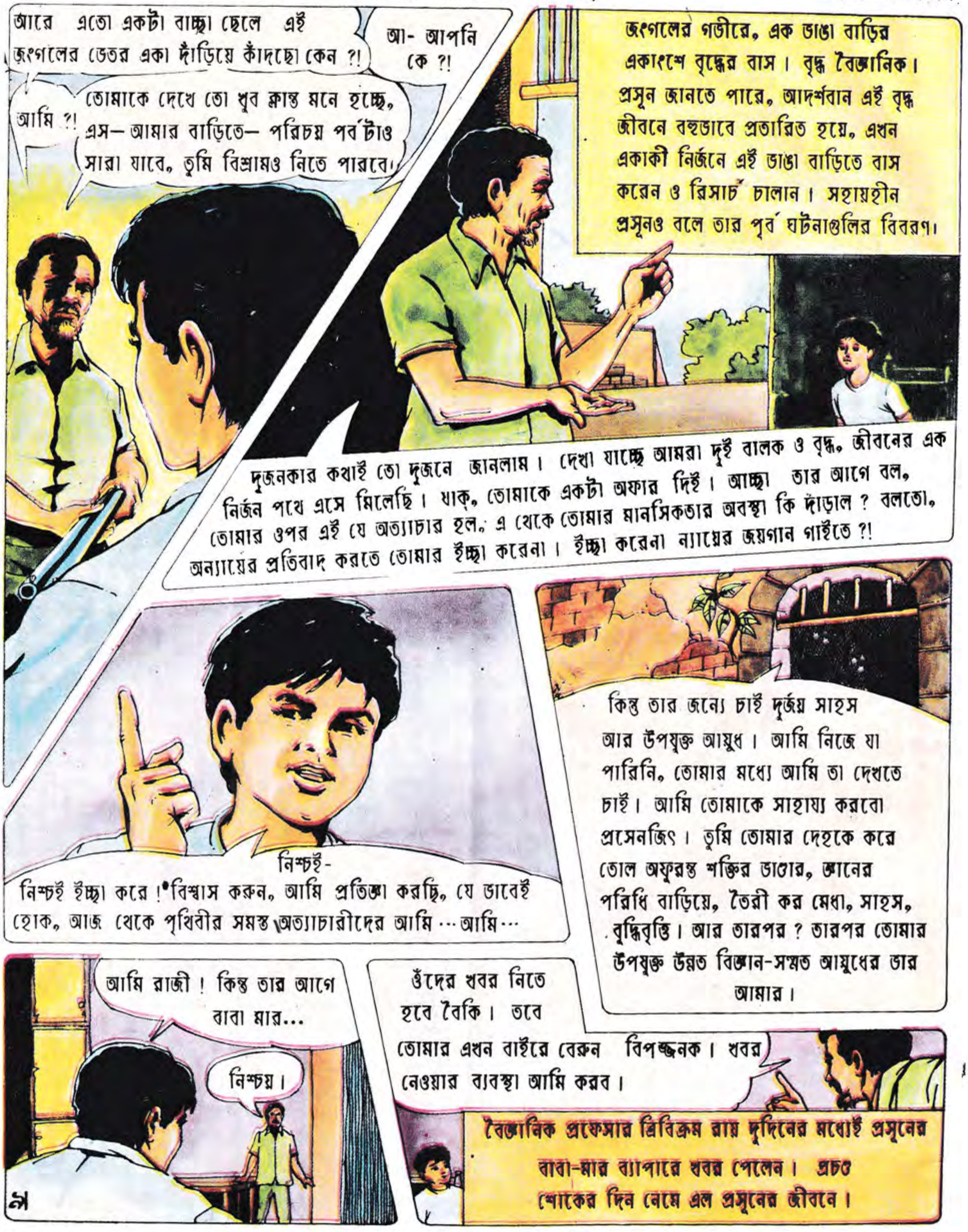
আরে এতো একটা বাচ্চা ছেলে এই জংগলের ভেতর একা দাঁড়িয়ে কাঁদছো কেন ?!
আ- আপনি কে ?!
আমি ?!
তোমাকে দেখে তো খুব ক্লান্ত মনে হচ্ছে, এস— আমার বাড়িতে— পরিচয় পর্বটাও সারা যাবে, তুমি বিশ্রামও নিতে পারবে।
জংগলের গভীরে, এক ভাঙা বাড়ির একাংশে বৃদ্ধের বাস। বৃদ্ধ বৈজ্ঞানিক। প্রসূন জানতে পারে, আদর্শবান এই বৃদ্ধ জীবনে বহুভাবে প্রতারিত হয়ে, এখন একাকী নির্জনে এই ভাঙা বাড়িতে বাস করেন ও রিসার্চ চালান। সহায়হীন প্রসূনও বলে তার পূর্ব ঘটনাগুলির বিবরণ।
দুজনকার কথাই তো দুজনে জানলাম। দেখা যাচ্ছে আমরা দুই বালক ও বৃদ্ধ, জীবনের এক নির্জন পথে এসে মিলেছি। যাক্, তোমাকে একটা অফার দিই। আচ্ছা তার আগে বল, তোমার ওপর এই যে অত্যাচার হল, এ থেকে তোমার মানসিকতার অবস্থা কি দাঁড়াল ? বলতো, অন্যায়ের প্রতিবাদ করতে তোমার ইচ্ছা করেনা। ইচ্ছা করেনা ন্যায়ের জয়গান গাইতে ?!
নিশ্চই- নিশ্চই ইচ্ছা করে ! বিশ্বাস করুন, আমি প্রতিজ্ঞা করছি, যে ভাবেই হোক, আজ থেকে পৃথিবীর সমস্ত অত্যাচারীদের আমি ···আমি···
কিন্তু তার জন্যে চাই দুর্জয় সাহস আর উপযুক্ত আয়ুধ। আমি নিজে যা পারিনি, তোমার মধ্যে আমি তা দেখতে চাই। আমি তোমাকে সাহায্য করবো প্রসেনজিৎ। তুমি তোমার দেহকে করে তোল অফুরন্ত শক্তির ভাণ্ডার, জ্ঞানের পরিধি বাড়িয়ে, তৈরী কর মেধা, সাহস, বুদ্ধিবৃত্তি। আর তারপর ? তারপর তোমার উপযুক্ত উন্নত বিজ্ঞান-সম্মত আয়ুধের ভার আমার।
আমি রাজী ! কিন্তু তার আগে বাবা মার...
নিশ্চয়।
ওঁদের খবর নিতে হবে বৈকি। তবে তোমার এখন বাইরে বেরুন বিপজ্জনক। খবর নেওয়ার ব্যবস্থা আমি করব।
বৈজ্ঞানিক প্রফেসার ত্রিবিক্রম রায় দুদিনের মধ্যেই প্রসূনের বাবা-মার ব্যাপারে খবর পেলেন। প্রচণ্ড শোকের দিন নেমে এল প্রসূনের জীবনে।

এরপর ধীরে ধীরে শুরু হল তার নিজেকে তৈরী করার সাধনা। প্রফেসার রায়ের সাহায্যে বছরের পর বছর নিজেকে তিলে তিলে নতুন মানুষরূপে গড়ে তুলল সে। প্রফেসার রায় এদিকে নিজের বৈজ্ঞানিক মেধাকে কাজে লাগিয়ে তৈরী করলেন প্রসূনের জন্যে বাছাবাছা কয়েকটি অস্ত্র।
নাও প্রসূন। আজ তোমার সাধনা সফল। ব্যাগে রয়েছে তোমার অভিযানে বেরুনোর উপযুক্ত পোশাক। তাছাড়া রয়েছে হুল ছোরা, তোমার বেল্টে লাগানো রিমোট কণ্ট্রোলের সাহায্যে ওটা স্বয়ংক্রিয়ভাবে ছুটে যায়।
এর মুখে আছে বিষ যা আততায়ীকে বেশ কিছুক্ষণ অজ্ঞান করে রাখবে। এটা একটা কাঁকড়াবিছের দাঁড়ার বর্ধিত রূপ, এটাও রিমোট কণ্ট্রোলে চলবে। দরকার মতো বেল্ট থেকে ছুটে গিয়ে আততায়ীকে আঁকড়ে ধরবে। তোমার চোখের জন্যে রইল বিশেষ ধরনের লেন্স লাগানো চশমা, যাতে অন্ধকারেও বহুদূর থেকে সবকিছু পরিষ্কার দেখা যাবে।
পোশাকটি আগুন ও তাপ নিরোধক বিশেষ এক ধরণের তন্তুতে তৈরী। বুট দুটোতে লাগানো আছে কৃত্রিম পাখনা আর জেট। জলে সাঁতার ও আকাশে দ্রুতগতিতে ভেসে যাওয়ার জন্যে। যাও, এবার পোষাকটা পরে এসোতো। কেমন মানায় দেখি।
একটু পরে—
বাঃ সুন্দর। আজ থেকে তোমার নাম হলো বৃশ্চিক— অর্থাৎ কাঁকড়াবিছে! আজ থেকেই শুরু হোক তোমার শুভ অভিযান। আরো একটা শুভ সংবাদ। শেষ ইন্টারভিউ-এ তুমি কলকাতায় দৈনিক বার্তাবহতে রিপোর্টারের চাকরী পেয়েছো। দিনে রিপোর্টার, রাত্রে হবে বৃশ্চিক, দুর্বৃত্তের যম!
হঠাৎ প্রসূনের মন বাস্তবে ফিরে আসে—
ক্-কি-হলো ?!
ক্যাঁ-চ-চ-
১০

সুধাংশু নন্দী

সুধীন্দ্রনাথ রাহা

গরমের ছুটিতে বিমলেন্দু বেড়াতে এল মাসির বাড়ি। নিজে সে কলকাতার ছেলে, মাসী থাকেন বগুড়া জেলার জয়পুরহাটে। পাট কেনা-বেচার বড় আড়ত আছে এইখানটায়, বিমলের মেসোও নাম-করা আড়তদার।

বিমলের বয়স কত আর? বছর বাইশ বড় জোর। কোন কলেজে যেন সেকেন্ড ইয়ারে পড়ছিল, আই-এস-সি দেবার কথা ছিল মার্চ মাসে, দেয়নি। "কেন দিলে না বিমু-দা?"—প্রশ্ন করে মাসতুতো ভাই সুধাংশু। মুখটা বাঁকিয়ে বিমল উত্তর দেয়—"কেমিস্ট্রির রিসার্চ নিয়েই ব্যস্ত ছিলাম রে! অঙ্ক-টঙ্কগুলো তৈরী হয়নি। দিলে লাভ হত না। কেমিস্ট্রিতে সেন্ট পারসেন্টই পেতাম নিশ্চয়, কিন্তু অঙ্কে গোল্লা খেতে হত। এ-দেশে তো প্রতিভার দাম কেউ দেয় না! সব রুটিনের দাস।"

সুধাংশু নিজে এবার ক্লাস টেন-এ উঠেছে মাত্র। রিসার্চ-এর কথা শুনে তার মাথাই গুলিয়ে যায়। মাস্টারমশাইদের মুখ থেকে "রিসার্চ" শব্দটা কুচিৎ কদাচিৎ না শুনেছে, তা নয়। তবে যা শুনেছে, তাতে এইরকম একটা ধারণাই যেন ঢুকেছিল মাথায় যে রিসার্চ করার সময় আসে এম-এসসি পাশ করার পরে। বিমুদা তাহলে এসব কী বলছে, এ্যাঁ? গুল?

জয়পুরহাট বন্দর এলেকা ছাড়িয়ে অল্পদূর গেলেই একটা মস্ত আমবাগান চোখে পড়ে মাঠের ভিতর। সবই দেশী আমের গাছ, আম তেমন ভাল নয় খেতে। কিন্তু তাহলেও সে আম নষ্ট হতে দেন না সুধাংশুর বাবা। ব্যবসায়ী মানুষ, টক আম থেকেও কী ভাবে পয়সা রোজগার করা যায়, তা তিনি জানেন। একটি আম বাজে লোককে নিতে দেন না তিনি। কখনো তলা থেকে কুড়িয়ে, কখনো গাছ থেকে পেড়ে, সব আম এনে ফেলেন আড়তের একটা টিনের চালায়। সেখানে 'বাহে' মেয়েরা এসে আমসত্ত্ব তৈরী করে সেই সব আম দিয়ে। তারপর দালাল আসে কলকাতা থেকে, সেই আমসত্ত্ব কিনে নিয়ে যায় চল্লিশ পঞ্চাশ টাকা মণ দরে। খরচ? এক মণ আমসত্ত্ব বানাতে বারো কি চৌদ্দ টাকা খরচ পড়েছে হেমাংশুবাবুর।

কিন্তু সে কথা থাকুক। আমসত্ত্ব নিয়ে আমাদের গল্প নয়, গল্প হচ্ছে আমবাগানটা নিয়ে। বিরাট বাগান। পাহারা দেবার জন্য মাইনে-করা একটা লোক বরাবর থাকে ওখানে। তার থাকার জন্য একটা টিনের চালা তৈরী করে দিয়েছেন হেমাংশুবাবু। সেখানেই সে রাঁধে-বাড়ে খায়-দায় বসবাস করে। আমের মরশুমে সে মরবার ফুরসুত পায় না, সারাক্ষণ টহল দিয়েই ঘুরতে হয়, মাঠের কিষাণেরা রাখালেরা যাতে আম চুরি করে নিয়ে যেতে না পারে।

মরশুম এলে আর মরবার ফুরসুত হবে না, একথা জানা ছিল বলেই পাহারাওলা হরচন্দোর বোধহয় এবার মরশুম আসবার ঠিক দিন সাতেক আগে মরে বসল। কীসে মরল, তা বোঝা

গেল না। আগের দিনও বিকালে তাকে দেখা গিয়েছিল সুস্থ মানুষ, পরের দিন সকালে তাকে দেখা গেল, বিছানায় মরে শক্ত হয়ে পড়ে আছে।

কীসে মরল, গেল না বোঝা, বুঝবার জন্য চেষ্টাও কেউ করল না। হেমাংশুবাবুর বয়ে গেছে চেষ্টা করার। আপনার জন কেউ থাকত যদি হরচন্দোরের, তাদের অবশ্য বয়ে যেতে পারত না। কিন্তু ধারে কাছে আপনার জন হরচন্দোরের কেউ ছিল না। তার বাড়ি এ তল্লাটে নয়। আজ বিশ বৎসর সে ঐ আমবাগানের পাহারাদার। এই বিশ বৎসরে সে কখনো নিজের দেশে যায়নি, বা তার নিজের দেশ থেকে কোনো আপনজন তাকে দেখতে আসেনি। কোথায় ছিল সেই দেশ? বিশ বৎসর আগে, কাজে বহাল হওয়ার সময় সে কী যেন একটা বলেছিল হেমাংশুবাবুকে—হয় শ্রীহট্ট, নয়ত শ্রীরামপুর, আজ আর তা মনে নেই তাঁর।

কীসে মারা পড়ল হরচন্দোর, কিনারা হলো না যখন, তখন মাঠের কিষাণেরা রটিয়ে দিল—বিদেশী মানুষটা মারা পড়েছে ভূতের কিল খেয়ে খেয়ে। ভূত তো থাকবারই কথা ও-বাগানে। যেমন-তেমন ভূত নয়, মামদো ভূত একেবারে। বাগানের ভিতর এক জায়গায় কয়টা মাটির ঢিবি আছে না? চিরকাল লোকমুখে এই কথাই রটে আসছে যে ঐ ঢিবিগুলো কবরের ঢিবি, এই যে পেল্লায় আমবাগান, একশো বছর আগে এর অস্তিত্বই ছিল না।

এখানটায় ছিল এক বর্ধিষ্ণু মুসলমান পল্লী, কী এক মড়ক এসে একেবারে উজাড় করে দিয়ে যায় সেই পল্লীকে, তারপর কে-জানে-কে জমিটা দখল করে নিয়ে আমবাগানের পত্তন করে এখানে। বাগান না করে আর করবে কী! এমন ডাঙা জমিতে আর কী ফসল হবে? আর লোকালয়? মামদো ভূতের মোকাবিলা করে বাস করবে ওখানে, এমন বুকের পাটা কার?

এইভাবেই মামদোর ইতিহাস একটা, আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে রয়েছেই এই বাগানের। কাজেই হরচন্দোরের মৃত্যু হয়েছে ভূতের হাতে, এ-কথা শুনে হঠাৎ কেউ হেসে উড়িয়ে দিতে পারল না সে-কথা।

কিন্তু এতে হেমাংশুবাবুর বাধল এক বিষম গেরো। তিনি আর পাহারাদার পান না বাগানের জন্য। একে তো তেপান্তর মাঠের মাঝখানে ঐ আমবাগান, এদিকে নিকটতম লোকালয় হলো জয়পুরহাট। দেড় মাইল পাক্কা। ওদিকে হলো বামুন-হাটা, সে আবার আড়াই মাইল। অন্য দুই দিকে মাঠ আদিঅন্তহীন, আত্রাই নদীর স্রোত নাকি বইত ঐখান দিয়ে কোন আদ্যিকালে, সেটা শুকিয়ে গিয়েছে মান্ধাতার আমলেই। কিন্তু শুকনো নদীগর্ভটা হয়ে রয়েছে মরুভূমির মতো বালুকাময়, জল মেলে না একশো ফুট না খুঁড়লে।

লোকালয়ের বাইরে এই আমবাগান, তায় ভূতুড়ে অপবাদ এর। কে মরতে আসবে এখানে? হেমাংশুবাবুর ভয় হলো—এবার আমের মরশুমে একখানা আমসত্ত্বও উঠবে না আড়তে।

সবাই-এর চোখে আতঙ্ক

এই সময়ে আবির্ভাব আই.এসসি পরীক্ষা থেকে পলাতক, রিসার্চ-স্কলার বিমলেন্দুর। পাহারাদার পাওয়া যাচ্ছে না, একথাটা তার কানে উঠতে দেরি হলো না, কারণ মাসীর বাড়িতে আজকাল ঐ কথাই হলো প্রধান একটা আলোচ্য বিষয়।

শুনবার পরে বিমল বলল মাসতুতো ভাই সুধাংশুকে—"চল তোদের বাগান দেখে আসি—"

সুধাংশু এক পায়ে খাড়া। ডেকে ডুকে আরও দুই বন্ধুকে সঙ্গে নিল, মোহনলাল আর আইনদ্দি। ওরা দুটি সুধাংশুর সঙ্গেই পড়ে, ভারি ভাব তিনজনের ভিতরে।

বাগানটা আগাগোড়া দেখল বিমল। গম্ভীরভাবে মত প্রকাশ করল—"জায়গাটা ভাল। ঘরখানাও মজবুত। আমিই পাহারা দেব বাগান এ-মরশুমে। কলেজ খুলতে তো সেই জুলাই মাস!"

বাগান পাহারা দেবে বিমলদা? শুনে তো চক্ষু চড়কগাছ সুধাংশুর। এমনধারা অবাক হয়ে গেল ছোকরা যে কোনো প্রশ্নই বেরুলো না তার মুখ থেকে দুই মিনিটের মধ্যে।

বিমলই বুঝিয়ে বলল—"এমন নিরিবিলি জায়গা। মানে একাধারে নিরিবিলি ও বাসোপযোগী জায়গা, মেলা খুব শক্ত রে। পেয়েছি যখন, ছাড়ছি না। এমনি একটা স্থানই আমার দরকার ছিল।

প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পাঠ্যপুস্তক তালিকা—১৯৮৭

● শিশু শ্রেণী ●

১। এসো পড়ি আঁক শিখি—শ্যামাপদ দত্ত ৫·০০
২। নিজে শেখ অ আ ক খ—ননী আইচ ৪·০০
৩। খুশীর পড়া—মধুসূদন মজুমদার ৬·০০
৪। আদর্শ লিপি ও সহজ বর্ণপরিচয় —অরুণকুমার ৬·০০
৫। ছবিতে অংক শেখ (শিশু শ্রেণী) —মধুসূদন দেব ৪·০০
৬। গুণতে মজা (ঐ) ২·৫০
৭। ছবি ছড়ায় ধারাপাত (ঐ) ৩·০০
৮। বুনিয়াদী ধারাপাত (ঐ) ৩·০০

● প্রথম শ্রেণী ●

১। হাসিরাশী—অরুণচন্দ্র দেব ৬·০০
২। সোনার কমল (১ম)—মধুসূদন দেব ৪·০০
৩। ছবিতে অংক শেখ (১ম) (ঐ) ৪·০০
৪। শিশুদের পরিবেশ (ভূগোল) (ঐ) ৪·০০
৫। ছোটদের A B C—ননী আইচ ৪·০০
৬। ছবি ছড়ায় A B C—দেব সাহিত্য কুটীর ৩·০০
৭। খোকা খুকুর A B C— (ঐ) ২·৫০
৮। ছবিতে ভারতের ইতিহাস (ঐ) ২·৫০

● দ্বিতীয় শ্রেণী ●

১। সোনার কমল (২য়)—মধুসূদন দেব ৪·৫০
২। নব গণিত সুধা (২য়) (ঐ) ৬·০০
৩। যুগে যুগে মানুষ (ইতিহাস)—শ্যামাপদ দত্ত ৬·০০
৪। পরিবেশ পরিচিতি (ভূগোল) (ঐ) ৬·০০
৫। Happy Primer (ঐ) ৬·০০
৬। সাঁঝের ছড়া—মধুসূদন দেব ২·০০

● তৃতীয় শ্রেণী ●

১। পাঠমালা (১ম) (বাংলা সাহিত্য) —রায়চৌধুরী ও নাথ ৫·০০
২। নূতন সিলেবাসের গণিত শিক্ষা (৩য় ভাগ)—হরেকৃষ্ণ দাস ১০·০০

● তৃতীয় শ্রেণী ●

৩। ছোটদের ভারত কাহিনী (ইতিহাস) —অলোক ঘোষ ৬·০০
৪। প্রাথমিক ভূগোল বিজ্ঞান—মধুসূদন দেব ৭·০০
৫। ছাত্রসাথী (প্রশ্নোত্তর) (ঐ) ১২·০০

চতুর্থ শ্রেণী

১। পাঠমালা (২য়) (বাংলা সাহিত্য) রায়চৌধুরী ও নাথ ৬·০০
২। নূতন সিলেবাসের গণিত শিক্ষা (৪র্থ ভাগ)—হরেকৃষ্ণ দাস ১০·০০
৩। ঐতিহাসিক কাহিনী—মধুসূদন মজুমদার ৭·০০
৪। ছোটদের ভূগোল বিজ্ঞান (ঐ) ৮·০০
৫। Happy Reader (I) —K. P. Chatterjee ৪·০০
৬। আধুনিক ছাত্রসুহৃদ (১ম) (প্রশ্নোত্তর) —মধুসূদন দেব ১৬·০০

● তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণী ●

১। প্রশ্নোত্তরে ব্যাকরণ ও রচনা শেখ —সত্যেন্দ্রনাথ মিত্র (নূতন সং) ১০·০০
২। বুনিয়াদী বাংলা ব্যাকরণ ও রচনা —মধুসূদন দেব ৯·০০
৩। প্রশ্নোত্তরে স্বাস্থ্য ও সমাজ—অরুণচন্দ্র দেব ৬·০০
৪। ছোটদের জানবার কথা (সংশোধিত সং) —ননী আইচ ৬·০০
৫। জ্ঞানের সন্ধানে—(সংশোধিত সং) —সুষমা সেন ৬·০০
৬। Peacock English Grammar —S. P. Dutta ৬·০০
৭। Peacock Word Book —M. S. Dev ৭·০০
৮। Childs Picture Word Book —A. C. Dev ৭·০০

দেব সাহিত্য কুটীর প্রাঃ লিমিটেড, ২১, ঝামাপুকুর লেন, কলিকাতা-৯

"নিরিবিলি জায়গা দরকার ছিল?" সুধাংশু বলল—"তুমি কি কবিতা লিখবে নাকি এখানে বসে?"

"কবিতা লেখা আর আমচোর তাড়ানো দুটো কাজ একসঙ্গে চালানো কি শক্ত হবে না দাদা?" এ প্রশ্নটা মোহনলালের। বন্ধুর সুবাদে সে এবং আইনদ্দি দুজনেই দাদা ডাকতে শুরু করেছে বিমলকে।

ঠোঁটের কোণে একটুখানি বাঁকা হাসি ফুটিয়ে বিমল বলল—"কবিতা ছাড়া আর বুঝি সাধনার বস্তু কিছু নেই? আর পাহারার কথা বলছিস? একসাথেই চলবে দুটো কাজ। দলে যদি আমরা চারজন থাকি, রয়েছিই তো এই চারজন, পালা করে দিব্যি ম্যানেজ করে নেব দুটোই।"

"চারজন রয়েছি?"—আইনদ্দি তাকায় মোহনের দিকে, মোহন তাকায় আইনদ্দির দিকে। তারা আমবাগানে বেড়াতে এসেছে, তা ঠিক। আগেও কতবার এসেছে। কিন্তু বেড়াতে এলেই দলভুক্ত হয়ে যেতে হবে, এমন কী কথা? আর, দলটাই বা কিসের?

তখন সেই আমবাগানের মাঝখানে দাঁড়িয়ে বিমল এক নাতিদীর্ঘ বক্তৃতা দিল তার তিনটি শ্রোতার অজ্ঞান তিমিরান্ধ চক্ষু জ্ঞানাঞ্জন শলাকার সাহায্যে উন্মীলিত করে দেবার জন্য।

বেলা তখন আন্দাজ দুটো। বিশাল বাগানের ঠিক মাঝখানটাতেই সেই টিনের চালা, যেখানে বিশ বছর বাস করে গিয়েছে সদ্য গতাসু হরচন্দোর। চালাটার চারপাশে বেশ খানিকটা জায়গা ফাঁকা, সেখানে আছে একটা পাতকুয়ো আর সেই কুয়ো ঘিরে কিছু তরিতরকারির চাষ। ইদানীং কয়েক দিন গাছগুলিতে জল পড়েনি, গরমে শুকিয়ে উঠেছে তারা।

জায়গাটা ফাঁকা, কাজেই চারদিক ছায়াস্নিগ্ধ হলেও ঠিক এইখানটায় অপরাহ্নের খররৌদ্র এসে পড়েছে কোন এক দিব্যলোক থেকে পথ-ভুলে-এসে হুমড়ি-খেয়ে-পড়া আলোকপ্রপাতের মতো। সে রৌদ্রে বিমলের তরুণ মুখখানি হয়ে উঠেছিল উদ্ভাসিত, তার তিন শ্রোতা যেন এক স্বর্গীয় মহিমায় মণ্ডিত দেখতে পেল তাদের এই শহুরে বন্ধুকে।

বিমল বলছিল দেশের কথা। পরাধীন ভারতের মর্মজ্বালার কথা। এক সাতসমুদ্র পারের বেনিয়ার জাতি এসে রক্তপায়ী বাদুড়ের মতো টুঁটি কামড়ে ধরেছে ভারতের, তার সমস্ত রক্ত শুষে নিচ্ছে চুমুকে চুমুকে। নীরক্ত হয়ে ভারত আজ মৃত্যুপথের যাত্রী, কে তাকে বাঁচাবে, তার নিজের সন্তানেরা ছাড়া?

আর সেই সন্তানেরা—কারা? এই যে চার তরুণ এখানে দাঁড়িয়ে আজ অপরাহ্নে, তারাও সেই চল্লিশ কোটি ভারতসন্তানেরই চারজন। চল্লিশ কোটির যা কর্তব্য, চারজনেরও তাই, যার যেটুকু সাধ্য, সে ততটুকুই করুক। সবাই যদি নিজের অংশের কাজটুকু বিধিমতে করে যায়, ঐ বেনিয়াগুলোকে তাড়াতে কতক্ষণ? পলাশীর আমবাগানে স্বাধীনতার সূর্য অস্ত গিয়েছিল আমাদের, আজ জয়পুরহাটের এই আমবাগানে ঐ দেখ সেই সূর্যেরই প্রকাশ আবার! এ আলো আশার আলো, এ আলো আসন্ন মুক্তির আলো!

বিমল বলতে পারে বেশ। তিন তরুণ শ্রোতা মুগ্ধ, অভিভূত হয়ে গেল তার তিন মিনিটের বক্তৃতা শুনে। তখন বিমল মৃদু হেসে বলল—"কলকাতায় বসে কেমিস্ট্রির রিসার্চ খানিকটা এগিয়ে রেখেছি। এইখানে বসে তা শেষ করব, যদি তোরা আমার সহায় থাকিস। সে রিসার্চের ফল কি দাঁড়াবে, তা জানিস? শোন্। আমি নিজের মৃত্যুবাণ তুলে দিচ্ছি তোদের হাতে। ইচ্ছে করলে এক্ষুণি তোরা আমায় জেলে দিতে পারিস। আমি বোমা বানাচ্ছি। রিসার্চ তারি।"

বো-মা! এক উত্তেজনার শিহরন, এক উন্মাদনার তড়িৎপ্রবাহ বয়ে গেল সুধাংশু, মোহন আর আইনদ্দির দেহের উপর দিয়ে। তারা জিভ কামড়ে ফেলল—জেলে পুরে দেবার নাম শুনে। তারপর, সব শোনার পর, মা কালী আর আল্লার নামে শপথ করে তারা প্রতিজ্ঞা করল—বিমলের কথামত তারা চলবে চিরদিন, কোনো যুক্তিতর্ক না তুলে, কোনো দ্বিরুক্তি না করে। তার জন্য মৃত্যু যদি বরণ করতে হয়, তারা সানন্দে তা করবে। ক্ষুদিরাম মরেছে, ভগৎ সিং মরেছে, সুধাংশু, মোহন, আইনদ্দি মরতে জানে না নাকি?

তখন তারা হরচন্দোরের ঘরের ভিতর গিয়ে ঢুকল। ঘরটা পরিষ্কার করতে হবে। হরচন্দোরের পরিত্যক্ত কাপড়-চোপড় বিছানাপত্র যা ছিল, সব মিলিয়ে মোট বাঁধা হলো একটা। আপাতত তা তুলে রাখা হলো কুয়োর ধারে লাউলতাহীন লাউমাচার উপরে, পরে এগুলি বিলিয়ে দেওয়া হবে ভিখিরীদের মধ্যে। ভাঙা হাঁড়িকুড়ি ফেলে দেওয়া হলো একটা গর্তে। জল তোলার দড়ি বালতি রয়েছে, পরখ করা হলো সেগুলি ব্যবহারযোগ্য আছে কিনা। তারপর ঘর ঝাঁট দিয়ে, ঝুল ঝেড়ে, দরজা জানালা সব খুলে রেখে দিল ওরা। সারা-রাত আজ হাওয়া খেলুক ঘরটাতে। কাল ব্লীচিং পাউডার ছড়িয়ে ফিনাইল দিয়ে ধুয়ে জীবাণুমুক্ত করা হবে। পরশু নিজেদের বিছানাপত্র এবং রিসার্চের মালমশলা নিয়ে এসে ডেরা বাঁধা যাবে এখানে। খাওয়া? বাড়ি থেকে দিয়ে যাবে এখন ছোকরা চাকরটা। তবে তাকে ঘরে ঢুকতে দেওয়া হবে না কখনো। কী হচ্ছে সে-ঘরে, তা এই চারজন ছাড়া কাকপক্ষীও জানতে পারবে না।

বাকী কিন্তু আসল কাজই এখনো। বাবার সম্মতি নেওয়া। সুধাংশুর সন্দেহ আছে, সে-সম্মতি মিলবে কিনা, কিন্তু বিমল হাসল তার সন্দেহের কথা শুনে। কলকাতার ছেলে, বাইশ বছরেই সে দুনিয়াটা চিনে ফেলেছে। আম যদি না যায় আড়তে, চার হাজার টাকার আমসত্ত্ব ফস্‌কে যাবে মেসোমশাইয়ের আঙুলের ফাঁক দিয়ে। কোনো বিষয়ী লোক তা হতে দেয় নাকি?

একদিক দিয়ে হিসাব ঠিকই হয়েছিল বিমলের, কিন্তু বেঠিক হয়ে গেল অন্যদিক দিয়ে। হেমাংশু ধোঁকায় পড়লেন যা ভেবে সেটা হলো এই যে পুলিশ কী ভাববে। চার চারজন উঠতি

বয়সের যুবক দিনের পর দিন জঙ্গলে বসে কী করছে, এ-বিষয়ে তাদের কৌতূহল চাগিয়ে ওঠা খুবই স্বাভাবিক। আজকালকার ছোকরাদের বিশ্বাস করা যায় নাকি? হেমাংশুই পারেন না বিশ্বাস করতে, তা পুলিশ তো দূরের কথা, আম পাহারা দেবে জঙ্গলে বসে? দিনরাত? দুই মাস বসে? এ-অজুহাত এতই হাস্যকর যে পুলিশ যদি তা বিশ্বাস করতে রাজী না হয়, তাহলে হেমাংশু তাদের দোষ দিতে পারবেন না।

এক ভরসা দারোগা নীলমাধব মজুমদার খুবই বন্ধুলোক। তাকে আগে থাকতে বলে রাখা যায় যদি– ?

তাই গিয়ে বললেন হেমাংশু। নীলমাধব তো হেসেই কুটপাট। "আরে, সুধাংশু? ও তো আমার নিজের ছেলেরই মতো! ওর নাড়ীনক্ষত্র তো আমার চেনা! ও কোন দুঃখে যাবে বেআইনী কাজ করতে? লেখাপড়া শিখুক, আমিই চেষ্টা করে ওকে একেবারে ইনস্পেক্টর করে দেব পুলিশে। ও যাবে কোন দুঃখে স্বদেশীদের দলে?"

দারোগার কথার ভাবে মনে হলো যত ছেলে স্বদেশীদের দলে গিয়েছে এ-যাবৎ, তারা সবাই গিয়েছে পুলিশ ইনস্পেক্টরের চাকরি পায়নি বলে।

যা হোক, দারোগার কাছে ভরসা পেয়ে হেমাংশু অনুমতি দিয়ে দিলেন ছেলেদের। তারা গিয়ে ডেরা-ডান্ডা ঠিক করে নিল হরচন্দোরের চালায়। হরচন্দোরের বাঁশের মাচা ভেঙে ফেলে সে-চালায় দুখানা বড় তক্তপোশ পেতে নিয়েছে তারা। আর নিয়ে গিয়েছে একখানা উঁচু টেবিল আর দুখানা টুল। বিছানাপত্রের সঙ্গে বিমলের নিজস্ব স্টিলের স্যুটকেসও গিয়েছে একটা। কলকাতা থেকে আসার পরে এটি একদিনও খোলেনি বিমল। এইবার খুলল আমবাগানের নিরিবিলিতে বসে। তার ভিতর দিয়ে বেরুলো একশো এক রকমের অ্যাসিড, গুঁড়ো, কিছু টোটাবারুদ ও একটা পিস্তল। সুধাংশু, মোহন, আইনদ্দির চোখে আতঙ্ক, গায়ে রোমাঞ্চ।

আমের মরশুম এসে গিয়েছে। জোর টহল দিচ্ছে সবাই পালা করে। একমাত্র বিমলই বেরোয় না পাহারাদারিতে। তার কাজ ঘরের ভিতর। রিসার্চ তার সত্যিই অনেক এগিয়েছিল কলকাতায় থাকতেই। দিন পনেরোর মধ্যেই সে বোমা বানিয়ে ফেলল।

আর সেই সময়ই পুলিশ এসে হানা দিল তাদের চালায়। নীলমাধব মৌখিক আশ্বাস যতই দিন হেমাংশুকে, নিজের কর্তব্যে ত্রুটি করেননি। আড়তে আম নিয়ে যাওয়ার জন্য যে গোরুর গাড়ি রোজ বাগানে আসছে, তার গাড়োয়ানকেই তিনি বাধ্য করে রেখেছেন লোভ এবং ভয় যুগপৎ দেখিয়ে। সে এসেছে, আম বোঝাই নেবার ফাঁকে ফাঁকে নজর রেখেছে চালার দিকে। তার ভিতরে যে শিশি বোতল নাড়াচাড়া হচ্ছে, মাঝে মাঝে ধোঁয়া বেরুচ্ছে কী-জানি-কোন অদৃশ্য জিনিস থেকে, সব সে রিপোর্ট দিয়েছে যথাযথ। নীলমাধব প্রায় নিশ্চিত হয়েছেন যে ওখানে বোমা-টোমা কিছু হচ্ছে।

পুলিশ এসে হানা দিল ভরদুপুরে। চাকর মনসুকিয়া ডাল-মাছ-দই-সন্দেশ সমেত টিফিন কেরিয়ার নামিয়ে দিয়ে সবে শহরে ফিরেছে, ওরা চারজন হাত-পা ধুয়ে খেতে বসবে-বসবে করছে, এমন সময়ে আইনদ্দি অনুচ্চ গম্ভীর গলায় বলে উঠল– "দাদা! পুলিশ!"

খাওয়া মাথায় উঠল, ঘরের কোণ থেকে একটা ব্যাগ তুলে নিল সুধাংশু। সুধাংশুই নিল, কারণ ব্যাগের সবচেয়ে কাছে দাঁড়িয়েছিল সেই। পুলিশ যদি এসেই পড়ে আচমকা, তা হলে তখন কার কী করণীয় হবে, আগে থেকেই তা রিহার্সাল দেওয়া আছে ওদের। ব্যাগ নিয়ে সুধাংশু দৌড়োলো আগে আগে, অন্য সবাই পিছনে ছুটল। ছুটল উত্তর-পুবের একটা বিশেষ জায়গা লক্ষ্য করে, সেখানে ঝোপঝাড় অতি নিবিড়। সেইখানে দাঁড়িয়ে পুলিশকে লড়াই দেবার মতলব তাদের। বোমা আছে, পিস্তল আছে, নিরস্ত্র তো নয়! মরতে যদি হয়, ফাঁসীতে না মরে গুলিতে মরবে। আর শুধু শুধুও মরবে না। মরবার আগে মেরেও যাবে দুই চারজনকে।

কিন্তু মানুষ ভাবে একরকম, হয়ে যায় অন্যরকম। ছুটতে ছুটতে হঠাৎ এক গাছের শিকড়ে পা বেধে হোঁচট খেলো সুধাংশু। সঙ্গে সঙ্গে ব্যাগের ভিতরে বোমা গেল ভীষণ শব্দে বিদীর্ণ হয়ে। সুধাংশু সঙ্গে সঙ্গেই মারা গেল। বিমলেরা তিনজন পুড়ে গেল দারুণভাবে, দারোগা নীলমাধবের একটা চোখ গলে গেল বোমার টুকরো লেগে। কনস্টেবলেরাও অল্পবিস্তর আহত হলো কয়েকজন।

বিমলেরা সেরে উঠল অনেকদিন পরে। বিমলের জেল হলো দশ বৎসর, মোহন আর আইনদ্দির পাঁচ বছর করে।

ছবি : শান্তিময়

জানো কী

- ☐ উপগ্রহে গিয়ে বিকল হয়ে গেলো মহাকাশযান। তারপর কি হলো?
- ☐ ভয়ংকর সেই গুন্ডা হাতির মোকাবিলা ফুকন সাহেব কি ভাবে করেছিলেন?
- ☐ তোতা পাখি ভোরবেলায় কি বলেছিলো?
- ☐ ভাগ্য জানা থাকলেও বোকাদের ভাগ্য সত্যিই কি ফেরে?
- ☐ ভীষণ বিপদ ক্যাপ্টেন কার্ক আর ব্রুস লির সামনে। তাঁরা কি করলেন?

এই সব প্রশ্নের উত্তর পাবে শুকতারার মাঘ সংখ্যায়। সেই সঙ্গে আরও অনেক কিছু।

কর্মই ধর্ম

অপর্ণা মুখোপাধ্যায়

কুঞ্জলালের বউ লক্ষ্মীকে গ্রামের সবাই ভালোবাসতো। তার স্বভাব ছিলো খুব মিষ্টি। আর কী কাজের! কোনো কাজ হাতে লাগতো না।

শান্তি-সুখের বন্যা ছিলো,
তাদের মাটির ঘরে।
কুঞ্জলালের লক্ষ্মী ছিলো,
সে ঘর আলো করে।

কুঞ্জলাল একটা দোকানে খাতা লিখতো। তাতে যা সামান্য কটা টাকা পেতো, লক্ষ্মী সেই সামান্য টাকাতেই সুন্দর করে সংসার চালাতো। অভাব কী তা কুঞ্জলাল জানতেও পারতো না।

কিন্তু কুঞ্জলালের ভাগ্যে এ সুখ বেশিদিন সইলো না। তিন দিনের জ্বরে হঠাৎ লক্ষ্মী মারা গেল। এখন কুঞ্জলাল কী করবে? ঘরে তার ছ'মাসের ছোট্ট শিশু কুসুম।

কত লোক কত পরামর্শ দিলো।

কুঞ্জলালের কোনোটাই তার পছন্দ নয়। এদিকে কুসুমের অযত্নও সে কিছুতেই সইতে পারে না। কী করবে! রান্নাবান্না নিজেই করতে শুরু করলো। খেতে হবে তো? কুসুমকে স্নান করিয়ে, জামাকাপড় পরিয়ে খাইয়ে দাইয়ে সে কাজে যেতো– কোনো কোনো দিন সংগেও নিয়ে যেতো। রাত্তির বেলায় সে কুসুমকে গান গেয়ে ঘুম পাড়াতো।

এমনি করে আদরে যত্নে কুসুম দিনে দিনে বড় হয়ে উঠলো। যা বায়না করে, কুঞ্জলাল তাই এনে দেয়। যা খেতে আব্দার করে তাই রেঁধে খাওয়ায়। ভালোমন্দ রান্না ছাড়া কুসুমের মুখেই রোচে না। এখন হলো কী আদরে আদরে কুসুমের মাথাটি গেলো বিগড়ে। সে নড়ে বসতে চায় না। জল পর্যন্ত গড়িয়ে খাবে না।

কুঞ্জলালের অবস্থাও তেমন নয় যে ঘরের কাজের জন্যে একটা লোক রাখবে। ইচ্ছে হলেও উপায় নেই। নিজেই কষ্ট করে সব করে।

কুসুম এসব তাকিয়েও দ্যাখে না। সে তার ফরমাস মতো জিনিস পেলেই খুশি। আর না পেলে চেঁচিয়ে কেঁদে বাড়ি মাথায় তুলবে।

সেদিন রাত্তির বারোটার সময় বায়না ধরলো–পায়েস খাবো। কুঞ্জ মাথায় হাত দিলো–কোথায় দুধ–কোথায় চাল, চিনি। গরীবের সংসার। সব কিছুই তো মজুত থাকে না। কিন্তু সে-কথা বোঝে কে?

কুঞ্জলাল যত বোঝাতে যায়, কুসুম ততই কাঁদে হাউমাউ করে।

শেষ পর্যন্ত ছেলের চোখের জল মুছিয়ে সেই রাত্তিরেই কুঞ্জ বেরুলো সব যোগাড় করতে।

সৎ আর ভালো ব্যবহারের জন্যে গ্রামের সবাই তাকে ভালোবাসে। তার মুখ চেয়ে দোকানী অত রাত্তিরেই দোকান খুলে চাল চিনি দিলো। পাশের প্রতিবেশী খানিকটা দুধও দিলো। সবাই বললো–

বাড়াবাড়ি অতি খারাপ,
যে না এটা মানে–
ভবিষ্যৎ হয় যে কালো,
পতন বয়ে আনে।

মাঝরাতে রান্না হলো পায়েস। কিন্তু সে-পায়েস খেয়ে কুসুম মোটেই খুশি হলো না। বাটিসুদ্ধ পায়েস উঠোনে ছুঁড়ে ফেলে দিলো। বললে, বিচ্ছিরি! এ কী পায়েস?

কুঞ্জলালের ভারী দুঃখ হলো। সংসারে এত ভালোবাসার দাম নেই। ধুত্তোর!! সংসারের নিকুচি করেছে, বলে সেই রাতেই কুসুম ঘুমিয়ে পড়লে পর, কুঞ্জলাল কাউকে কিছু না বলে বাড়ি ছেড়ে চলে গেলো। কোথায় সে গেলো কেউ জানলো না।

রোজ সকালে বাবা আদর করে কুসুমের ঘুম ভাঙায়। আজ বেশ বেলা হয়ে গেছে। সারা উঠোনে রোদ। কাকগুলো পাঁচিলে বসে কা–কা-কা করে ডাকছে।

কুসুমের ঘুমটা হঠাৎ ভেঙে গেলো। অনেক বেলা হয়ে

গেছে। ভীষণ খিদে পেয়েছে! বাবার ওপর খুব রাগ হলো। কুসুম চেঁচিয়ে ডাকলো—বাবা, বাবা।

কুসুমের গলা পেয়েই কুঞ্জ পড়ি কি মরি করে ছুটে আসতো। আজ ডেকে ডেকে কুসুমের গলা ভেঙে গেলো।

কোথায় বাবা? শেষে উঠে এ-ঘর ও-ঘর, দাওয়া, বাগান—সব খুঁজলো। খুঁজে না পেয়ে তার রাগ হলো। সকালে মুখ হাত না ধুইয়ে, খেতে না দিয়ে গেলো কোথায়? কুসুম রাগ করে আবার বিছানায় শুলো। বাবা আসুক আগে।

সকাল গড়িয়ে প্রায় দুপুর হতে চললো। কুঞ্জ ফিরলো না। কুসুমের এবার সন্দেহ হলো। কাল রাতের ঘটনা মনে পড়লো। মনে পড়লো তখন বাবা রাগ করে বলেছিলো, "আমি চলে গেলে বুঝবি তখন কত ধানে কত চাল।" তবে কি বাবা সত্যি সত্যি চলে গেলো?

সকাল সাতটার মধ্যেই মাটি কাটার কাজে চলে যায় কুসুম।

এখন উপায়? চারিদিকে কাজ ছড়ানো। এত কাজ সে করবে কী করে? মুখ ধুতে গেলে কুয়ো থেকে জল তুলতে হবে। বাসি জামাকাপড় ছাড়তে হবে। সেগুলো কাচবেই বা কে? কে খাবার তৈরি করবে, কে খেতে দেবে? কে বাসন মাজবে?

কুসুমের খুব কান্না পেলো।

রোজ রোজ এত কাজ?
মাথায় যেন পড়লো বাজ।

দুপুর হয়ে গেলো। এখনও মুখে জল পর্যন্ত পড়েনি। শেষে বিছানা ছেড়ে উঠতে বাধ্য হলো সে।

রান্নাঘরে হাঁড়ি খুলে দেখলো—রাতের দুটি ভাত জল দেওয়া আছে।

রাতের বাসি খাবার কুসুম খাবে? কোনোদিন খেয়েছে? ঘুম থেকে উঠেই ভালো ভালো জলখাবার মুখের কাছে হাজির পেতো। কুঞ্জলাল ছেলের সুখের জন্যে ভোরবেলায় উঠে খাবার-দাবার বানাতো। মুখের সামনে খাবার ধরে তবে ঘুম থেকে ডাকতো। বাসি খাবার-টাবার যা বাঁচতো, কুঞ্জলাল নিজেই সেগুলো খেতো। নষ্ট করতে মন চাইতো না। কষ্টের রোজগার!

কুসুম বলতো, কেন খাও ঐ পচা খাবার?

কুঞ্জ হাসতো। ছেলেকে কোলে টেনে নিয়ে বলতো, ভগবান যা জোটান, তাই আনন্দ করে নিতে হয় বাবা। কতজনের ভাগ্যে এইটুকুও জোটে না।

কুসুম সে কথা বুঝতো না। বুঝবে কী করে? কুঞ্জ কি তার কোনো অভাব রেখেছে? একটা ছেলে বলে রাজার যত্নে রেখেছে। এর জন্যে তাকে কত কষ্ট করতে হয়, কত পরিশ্রম করতে হয়। কুঞ্জ ভাবতো কুসুম আরো বড় হলে নিশ্চয়ই সব বুঝবে।

কুসুম সারা রান্নাঘর তছনছ করে ফেললো। কোথাও আর কিছু পেলো না। শেষে পেটের জ্বালায় ঐ ভিজে ভাতই খেলো কাঁচা পেঁয়াজ দিয়ে।

খেয়ে দরজা বন্ধ করে ঘুম দিলো। ঘুম ভাঙলো সেই রাতে। এবার সত্যি সত্যিই দুশ্চিন্তা হলো। বাবা কোথায় গেলো! এমন তো কখনও হয়নি।

জল খেতে গিয়ে কুসুম দেখলো কুঁজোর জল ফুরিয়েছে। দড়ি বালতি নিয়ে কুয়োয় গেলো। কুঁজো ভর্তি করে জল তুললো। জল খেয়ে আবার শুয়ে পড়লো।

আজ বড্ড খাটুনি গেছে। অনেক কাজ করতে হয়েছে। কুয়ো থেকে জল পর্যন্ত তুলতে হলো। ভাবতে ভাবতে অল্পক্ষণের মধ্যেই সে ঘুমিয়ে পড়লো।

সকালে ঘুম ভাঙতেই সব মনে পড়লো। আর শুয়ে থাকা চলে না। শুয়ে থাকলে কেউ খেতে দেবে না।

পাশের বাড়ির রামুকাকা মাঝে মাঝে এ বাড়িতে আসতো। কুঞ্জলালের বহুদিনের বন্ধু। কুসুম রামুকাকার কাছেই গেলো।

রামুকাকা বাগানে একটা শুকনো গাছ কাটছিলো। কুসুমকে দেখে অবাক হলো।

কুসুম বললে, কাঠ কেটে কি হবে?

রামুকাকা তাচ্ছিল্যের হাসি হাসলো। বললে—দিব্যি সুখে আছো। তুমি এসব কী বুঝবে? কাঠ কেটে জ্বালানি হবে, তাও জানো না? এত বড় ছেলে হয়েছো?

এরপর কুসুমের টাকা চাইতে লজ্জা হলো। কিন্তু উপায়ই বা কি? বাবা থাকতে কিছুই ভাবতে হয়নি। বললে—কিছু পয়সা দেবে কাকা? কাল বাবা চলে গেছে। ঘরে কিছু খাবার পর্যন্ত নেই।

কুঞ্জলালের চলে যাওয়ার খবর শুনে রামুকাকা চমকে গেলো। কিন্তু কি আর করবে! মনের বিরক্তি গোপন করে কুসুমকে কিছু পয়সা দিলো।

খবরটা সারা গ্রামে ছড়িয়ে পড়লো। কুসুমের ওপর কারুর দয়া হলো না। সব্বাই বললে—ঠিক হয়েছে—

যেমন কর্ম
তেমনি ফল,
ফেলুক এখন
চোখের জল।

সত্যিই কেউ কুসুমের দিকে ফিরে তাকালো না।

চাল ডাল তরিতরকারি কিনে কুসুম বাড়ি ফিরলো।

কিন্তু রান্না বললেই তো রান্না হয় না। দেখলো ঘরে কোনো মাজা বাসন নেই। আগুনই বা কোথায়?

বাসন মেজে, কাঠ কেটে যখন কুসুম রাঁধতে এলো তখন বেশ বেলা হয়ে গেছে।

রান্নাঘরে এসে তার চক্ষুস্থির। কেলো বেড়ালটা ডিম দুটো ভেঙে ফেলেছে। চাল, নুন, ডাল সব ঠোঙা ফেটে ফুটিফাটা। নখ দিয়ে সব আঁচড়েছে। কাজ করতে যাওয়ারও এত ঝকমারি! এখন প্রতি পদে ঠেক খেতে হচ্ছে। শেখানোরও কেউ নেই। বাবার জন্যে খুব কষ্ট হতে লাগলো কুসুমের। বাবাকে সে কত কষ্টই না দিয়েছে। কুসুম কাঁদতে লাগলো। খানিকক্ষণ কেঁদে মনটা শান্ত হলো। আগুন জ্বেলে চাল আর ডাল ফুটিয়ে কোনোমতে তাই খেলো।

সবাই জানে কুসুমের মা নেই। বাবাও চলে গেছে। তবু একজন প্রতিবেশীও উঁকি মেরে দেখতে এলো না।

এবার কুসুমেরও জেদ বেড়ে গেলো। প্রতিজ্ঞা করলো সব কাজ সে শিখে নেবে। দুপুরে তার ঘুম এলো না। ঘরদোর সব পরিষ্কার করলো। খাবার জল তুললো। তারপর ঘরের দরজায় তালা দিয়ে বেরুলো। কাজ না করলে কেউ এমনি এমনি টাকা দেবে না।

ওর মতন বয়েসে আর কী কাজই বা পাবে। তবুও হাল ছাড়লো না। একটা দোকানে গিয়ে বললে—আমায় একটা কাজ দেবেন?

দোকানী কুসুমকে বললো, তোমায় তো চিনি না বাপু।

অনুবাদ সিরিজ

আলেকজাঁন্দ্রে দুমার
কাউন্টেস দ্য চার্নি
দ্য কনস্পিরেটর্স

রবার্ট লুই স্টিভেনসনের
দি বটল ইম্প

মেরী শেলীর
ফ্রাঙ্কেনস্টিন

চার্লস ডিকেন্সের
গ্রেট এক্সপেক্টেশনস
নিকোলাস নিকোলবি

মার্ক টোয়েনের
এ কানেক্টিকাট ইয়্যাংকি ইন্ কিং
আর্থার্স কোর্ট
পাডনহেড উইলসন

ভিক্টর মারি হ্যুগোর
দি ম্যান হু লাফ্‌স

লী ওয়ালেসের
দ্য ফেয়ার গড্

জুলে ভার্নের
লাইটহাউস

চার্লস কিংসলির
হাইপেশিয়া

জর্জ এলিয়টের
মিডল মার্চ
সাইলাস মার্নার

এইচ. জি. ওয়েলসের
দ্য ফার্স্ট মেন ইন দ্য মুন
দ্য ওয়ার অব দ্য ওয়ার্লডস

দেব সাহিত্য কুটীর (প্রাঃ) লিঃ
২১ ঝামাপুকুর লেন, কলকাতা ৯

তাছাড়া কী কাজ করতে পারো ? লেখাপড়া শিখেছো কিছু ?

—না। লেখাপড়া তো জানি না। কুসুম মাথা নাড়লে।

—সেকি ? এত বড় ছেলে লেখাপড়া জানো না ? তাহলে আর কী কাজ করবে! আমার একজন হিসেব লেখবার লোকের দরকার ছিলো। তুমি বাপু অন্য জায়গায় দ্যাখো।

কুসুমের ভীষণ লজ্জা হলো। যত জায়গায় যায় সকলেই ঐ এক কথা আগে জিজ্ঞেস করে। মনে পড়লো বাবা কত বলতেন লেখাপড়া করার জন্যে। কিন্তু কুসুম গ্রাহ্য করেনি। এখন আপশোস করে আর কী হবে।

সারাদিন ঘুরে ঘুরেও কোথাও কোনো কাজ পেলো না। শেষে এক জায়গায় দেখলো অনেক লোক মাটি কাটছে, আর কিছু লোকে সেই মাটি ঝুড়ি করে নিয়ে নিয়ে আর এক জায়গায় ফেলছে।

কুসুম তাদের সর্দারের কাছে গিয়ে বললে, আমাকে কাজে নেবে ? আমার একটা কাজ চাই।

কুসুমের কথা শুনে সর্দার অবাক। বললে, তুমি এইটুকু ছেলে এত কষ্ট করতে পারবে ?

—হ্যাঁ, নিশ্চয় পারবো। দিয়ে দ্যাখো।

সর্দার খুশি হলো। বললে, কাল সকালে সাতটার সময় এসো। তোমাকে কাজে নেবো। তবে ঠিক সময় আসা চাই। যার সময়ের হিসেব থাকে না, তার জীবনে কিছু হয় না।

কুসুমের মনে এবার খুব আনন্দ হলো। যাই হোক, যে কাজই হোক, কুসুম ঠিক পারবে। টাকা রোজগার করবে। কাজে আর তার কোনো ভয় লাগছে না।

মাসখানেকের মধ্যে কুসুম বদলে গেলো। আর বেলা পর্যন্ত ঘুমোয় না। সূর্যি-ওঠা ভোরে, পাখি জাগার আগেই ওঠে।

ঘরদোর পরিষ্কার করে। জল তোলে। রান্না করে। এমন কি বাড়ির সামনে বাগানটাও কিছুদিনের মধ্যে পরিষ্কার করে ফেললো। তাতে কত রকমের সবজির বীজ বুনলো। দেখতে দেখতে কচি গাছে বাগানটা ভরে উঠলো।

রান্না করে খেয়ে সকাল সাতটার মধ্যেই কুসুম মাটি কাটার কাজে চলে যায়। বিকেলে ফিরে গাছে জল দেওয়া, রাতের রান্না থেকে বাড়ির যাবতীয় কাজ সবই করে। মনে ভাবে,—

পরিশ্রমে ক্লান্তি আছে,
দুঃখ কিছুই নাই,
সবল শরীর, তাজা মনে
তৃপ্তি খুঁজে পাই।

বাবার কথা মনে পড়ে। মনে হয়, আহা, বাবা যদি দেখতো ! কী খুশিই না হতো !

বাবার ভালোবাসা সে এখন প্রতি মুহূর্তেই অনুভব করে।

সেদিন রাতে খেতে বসে খাবার আর মুখে উঠতে চায় না। কেন যেন আজ বাবার জন্যে ভীষণ মন কেমন করছে। চোখে খালি জল ভরে আসছে।

হঠাৎ দরজায় ঠক্‌ঠক্ আওয়াজ।

কুসুম চমকে উঠলো। এত রাতে আবার কে এলো ?

বাইরে কখন বৃষ্টি শুরু হয়েছে টেরই পায়নি। গুর্ গুর্ করে মেঘ ডাকছে। সন সন্ করে হাওয়া চলছে। আবার দরজায় টোকা। নাঃ, মনের ভুল তো নয়। কেউ নিশ্চয় ডাকছে।

কুসুম তাড়াতাড়ি উঠে দরজা খুলে দিয়ে অবাক। সামনে দাঁড়িয়ে বাবা। খুব ভিজে গেছে। কুঞ্জলালের সারা গায়ে জল।

বাবাকে দেখে কুসুমের খুশি আর ধরে না। তাড়াতাড়ি ছুটে গিয়ে আলনা থেকে একটা শুকনো গামছা আর একটা ধুতি এনে বাবার হাতে দিলো।

কুঞ্জলাল তাকিয়ে দেখলো সমস্ত ঘরদোর ঝক্‌ঝক্ তক্‌তক্ করছে। আলনা সুন্দর করে গোছানো।

বাবাকে তাকাতে দেখে কুসুম লজ্জা পেলো। বললো, কর্মই ধর্ম—এই কথাটা সেদিন বুঝিনি বলে তুমি হারিয়ে গিয়েছিলে। আজ ভগবান আবার তোমায় ফিরিয়ে দিলেন। আমি এবার তোমার সব কথা শুনবো। তোমাকে কোনো কষ্ট দেবো না।

ছেলের কথা শুনে কুঞ্জলালের চোখে জল এসে গেলো। সে কুসুমকে বুকে জড়িয়ে ধরলো।

তারপর কুসুম খাবার আবার গরম করে, আসন পেতে পরিপাটি করে, বাবাকে ডাকলো। কুঞ্জলাল বিশ্বাস করতে পারছিলো না। এ কি তার সেই কুসুম !

ছবি– শুকতারা রায়

দীর্ঘ প্রতীক্ষার পর আবার
প্রকাশিত হয়েছে
ছাত্র-ছাত্রীদের একান্ত আপনার
সরল অভিধান
দাম : টাঃ ২০.০০
(সম্পূর্ণ পরিমার্জিত, পরিশোধিত এবং পরিবর্ধিত)
সবার মুখে হাসি ফুটিয়ে তুলতে
দেব সাহিত্যের অনবদ্য সংকলন
হাসির হুল্লোড়
দাম : টাঃ ১৮.০০
সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজের
দুরন্ত এক অ্যাডভেঞ্চার-কাহিনী
সাহারার সন্ত্রাস
দাম : টাঃ ১২.০০
দেব সাহিত্য কুটীর (প্রাঃ) লিমিটেড
২১ ঝামাপুকুর লেন, কলকাতা–৯

যাদের দেখা যায় না

আশা দেবী

ডুয়ার্সে চাকরি নিয়ে গিয়েছি। আপাতত একাকী। নতুন জায়গা ; এর হালচাল সম্পূর্ণ না জেনে সপরিবারে যাওয়ার বিঘ্ন আছে—তাই একা এসেছি।

চাকরিটা কি করে পেলাম ? বন্ধু গৌতমের যত্ন ও চেষ্টায়। সে-ই এটা আমাকে জুটিয়ে দিয়েছে। তাই তার ওপর আমার কৃতজ্ঞতার আর শেষ নেই। কিন্তু চাকরিটা জুটিয়ে দিয়ে সে গেল কোথায় ? আজ দুমাসেরও বেশী কাজে জয়েন করেছি, বহু খুঁজেছি কিন্তু গৌতমের কোনো খোঁজ পাইনি। কেউ কোনো খোঁজ দিতেও পারেনি। আশ্চর্য ! ও কি তবে অন্য কোথাও ভাল কাজ পেয়ে চলে গেল ?

নিঃসঙ্গ আমি। বই-ই আমার সঙ্গী। বই না পড়লে আমার রাতে ঘুম আসে না।

সেদিন একটা বই পড়ছিলাম ইজিচেয়ারে শুয়ে শুয়ে। ঠান্ডা কনকনে রাত। দূরে ডুয়ার্সের ঘন অরণ্য জমাট বেঁধে যেন কালো ক্রেয়নে আঁকা ছবির মতো দেখাচ্ছে। স্টেশনের ক্ষীণ আলো কুয়াশার চাদর মুড়ি দিয়ে কেমন দপদপ করতে লাগলো। উড়ে গেল একা নিশাচর পাখি বিশ্রী আওয়াজ করে।

টেবিলের জ্বলন্ত লণ্ঠনটা দপদপ করে খানিক কালি তুলে হঠাৎই নিভে গেল। ঘরটা ভরে গেল পোড়া কেরোসিনের গন্ধে আর ঘনীভূত অন্ধকারে। সঙ্গে সঙ্গে উত্তরের এক ঝলক হিমেল হাওয়া পাগলের মতো আছড়ে পড়ে ঘরের দরজা জানালাগুলো সব ক্ষিপ্ত হাতে খুলে দিল।

চমকে উঠে আমি মাথার তলায় রাখা দেশলাইটা খুঁজতে লাগলাম আঁতিপাতি করে।

পেছন থেকে কে বললে : এই নে দেশলাই—হয়তো ড্যাম্প লেগেছে, জ্বলবে না। তবে চেষ্টা করে দেখতে দোষ কী ?

গৌতম ? তুই ?—আমি অবাক হয়ে গেলাম।

হ্যাঁ-রে বিমল। দেখতে এলাম তোকে।

এই রাতদুপুরে ? তোমার আর আসবার সময় হলো না !

না ! আমার সময় বড় কম। তোর কাছে আমি কিছু বলবো। কথাগুলো খুবই জরুরী। আমার সঙ্গে একটু আসতে হবে বাইরে।

আমি খুশী হয়ে বললাম : এটা আর বেশী কথা কি ! চল কোথায় যেতে হবে। এ চাকরিটাও তো তোর জন্যেই পেয়েছি। তুই আমার কত উপকারী বন্ধু। তার ওপর

ছোটবেলার খেলার সাথী–যাব নিশ্চয়ই, দাঁড়া ! গায়ে একটা চাদর দিয়ে নিই। বাইরে ঠান্ডা।

বাইরে বেরিয়ে আমরা পাশাপাশি হাঁটতে লাগলাম। কিন্তু গৌতম কেন যেন একটু দূরে দূরে আমাদের মধ্যে একটা তফাৎ বাঁচিয়ে চলতে লাগল।

হঠাৎ লক্ষ্য পড়লো গৌতমের গা খালি ! ঠান্ডার মধ্যে খালি গায়ে গৌতম হাঁটছে কি করে !

আমি ব্যস্ত হয়ে উঠলাম,একি তোর গায়ে যে কিছু নেই ? তোর শীত লাগছে না ? নে আমার এই চাদরটা।

গৌতম কিছু না বলে আমার দিকে স্থিরদৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলো কিছুক্ষণ, তারপর বললো ঃ আমার শীত লাগে না। ওটা তুই রাখ।

তার দৃষ্টিতে কী ছিল জানি না। আমি যেন কেমন হতবাক হয়ে গেলাম। কিছু যে বলবো তাও পারলাম না। চুপ করেই চলতে লাগলাম। রাতের ঘন অন্ধকারে গৌতমকে ভাল করে দেখা যাচ্ছিল না। অনুমানে বুঝছিলাম সে আমার সংগেই আছে।

খানিকটা দূরে দুটো পাশাপাশি পাথর রাস্তার ওপরই পড়ে ছিল। গৌতম নিজে একটার ওপর বসে অন্যটা আঙুল দিয়ে আমাকে দেখিয়ে দিয়ে বললে ঃ বস, দরকারী কথাটা আগে সেরেই নি। তুই কিন্তু কোনো প্রশ্ন না করে সব কথা শুনে যাবি আগে। হ্যাঁ–হুঁ করবারও দরকার নেই, তারপর বন্ধুর জন্যে যা পারিস করবি।

আমি বললাম, বেশ, বল কি বলবি ?

গৌতম শুরু করলো। আমি একটা ব্যবসায়ী ফার্মে চাকরি করতাম। ওরা আমাকে অনেক টাকা মাইনে দেবার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল। কিছুদিন কাজ করবার পর আমি বুঝতে পারি ওরা সৎভাবে টাকা রোজগার করে না। বরং খুবই অসৎ পথ বেছে নিয়েছে টাকা করবার জন্যে। আমার এ ব্যাপারটা একেবারেই পছন্দ নয়। এটা ওরা বুঝতে পেরে আমাকে তাদের টাকার

বস, দরকারী কথাটা আগে সেরে নিই।

একটা মোটা অংশ দিয়ে আমার মুখ বন্ধ করে দিতে চায়। কিন্তু আমি ওদের ওই পাপের টাকা একেবারেই নিতে চাইনি। বরং আমাকে এ সব টাকার অংশ দিতে চাইলে আমি চাকরি ছেড়ে দেব বলি, তখন ব্যাপারটা আরো ঘোরালো হয়ে ওঠে। ওরা আমাকে নজরবন্দী করে ঘরে আটকে রাখে।

একদিন আমি গভীর রাতে পালাবার চেষ্টা করে ধরা পড়ে যাই। খুবই ভয় পেয়েছিলাম ওরা বুঝি আমাকে মারধোর করবে। কিন্তু কিছুই করলো না দেখে অবাক হয়েছিলাম। তবে ওদের চালচলন, চোখ মুখের চাহনি দেখেও বুঝতে পারছিলাম আমার জন্যে আরো ভয়ংকর কিছু অপেক্ষা করে আছে—

আমি রুদ্ধশ্বাসে গৌতমের কথা শুনছিলাম। আর শুনছিল নিথর আকাশ–নিশুতি রাত–আর ঘুমন্ত বন। মাঝে মাঝে রাতচরা পাখির আওয়াজ আর বাতাসে ঝাউবনের শনশন শব্দ ছাড়া আর কিছুই শোনা যাচ্ছিল না। পাশে তাকিয়ে দেখলাম গৌতম বেশ দূরেই বসেছে। কেন? আমার কাছে এসে বসলে কী দোষ হতো! আমি কথা বলতে যাব, ঠিক তখনই গৌতম বুক ভরে নিঃশ্বাস নিয়ে ক্লান্ত ধরা গলায় আবার বলতে শুরু করলো: ওরা আজ হঠাৎ আমাকে বললো, অনেকদিন ঘরে বন্দী আছ, চল, আজকে একটু বেড়িয়ে আসবে।

ঘুমন্ত আমাকে শীতের রাতে ঘুম ভাঙিয়ে তুলে বেড়াতে নিয়ে যেতে চাওয়ায় আমি ভয়ে চমকে উঠেছিলাম। কিন্তু সে ভাব প্রকাশ না করে খুব ঠান্ডা গলায় বলেছিলাম: এত রাতে বেড়াতে যাওয়া, থাক না আজ। অন্য আর একদিন যাওয়া যাবে।

কিন্তু ওরা আমাকে ছাড়েনি। জোর করে গাড়িতে তুলেছিল। তারপর গাড়ি ছুটিয়েছিল জঙ্গলের পথে। গভীর বন পাহাড় জঙ্গল পেরিয়ে ওরা একটা ছোট জলার ধারে এসে থেমেছিল। সেখানে আমাকে ওরা শাসাতে লাগলো, চুরির টাকার ভাগ নিতে হবে, তা না হলে ওখানেই আমাকে ওরা শেষ করে দেবে।

তুমি তো জান বিমল, আমি মার একমাত্র ছেলে। মার কাছে কখনও কোনো অন্যায় করবার শিক্ষা পাইনি। চুরি করা টাকা আমি কেমন করে মার হাতে তুলে দেব। তার চেয়ে তো আমার....

আমার দ্বিধা দেখে ওরা বুঝে নিল আমি আর যাই হই চোর নই। তারপর আমাকে ওরা খুন করে ওই জঙ্গলে ফেলে দিয়ে গেল।

এতক্ষণ আমি স্তম্ভিত হয়ে গল্প শুনছিলাম। এবার চমকে উঠলাম। তবে যার সঙ্গে আমি এতদূর এলাম সে কি আমার বাল্যবন্ধু গৌতম নয়! তার প্রেতাত্মা। সমস্ত শরীর আমার হিম হয়ে গেল। এত শীতেও ঘেমে উঠলাম।

গৌতম আমার অবস্থা বুঝতে পেরে বললো, ভয় পাস না। তোর তো আমি কোনো ক্ষতি করবো না। আমি তোর সাহায্য চাই। করবি?

বল?—আমি সাহসে ভর করে বললাম।

আমি আমার মার কাছে যেতে পারবো না। কারণ মা যদি বুঝতে পারেন আমি নেই, তাহলে আর বাঁচবেন না। তিনি আজ কদিন থেকেই মনে মনে কী যেন বুঝে ঘরে শুয়ে শুয়ে কাঁদছেন। তুই গিয়ে আমার নাম করে এই টাকা কটা ওঁর হাতে দিবি। বলবি: গৌতম দিয়েছে। আর কিছু বলবি না।

আর ওই পাথরের পাশে আমার শবটা পড়ে আছে, ওটার সন্ধান আর ওই বদমাশগুলোর সব কথা পুলিশের কাছে গিয়ে বলে দিবি। ওদের সাবধান করে দিবি ওরা যেন কোনোমতে তোর নামটা প্রকাশ না করে। আমার শবের পাশে আমার মানি ব্যাগটা পড়ে আছে, ওটা ভাই তুলে নে। ওতেই সবকিছু পাবি।

হিম ঠান্ডা বাতাসের সঙ্গে ভোরের আলোর জোয়ারে মিশে গেল গৌতম। আর ওকে দেখা গেল না।

ছবি: শুকতারা রায়

আয়ুর্বেদ চিকিৎসার এক সফল গবেষণা

ধবল বা শ্বেতীর চিকিৎসা

সাদা দাগ অসাধ্য নয়। সঠিক চিকিৎসায় যেকোন অসুখের মত এ রোগ ও সেরে যায়। বহু বছরের গবেষণায় সাদাদাগ সারাতে আমরা সাফল্য লাভ করেছি

চিকিৎসা এতই শক্তি শালী যে একবার ব্যবহারেই রং বদলাতে থাকে এবং রোগের কারণগুলি বিনাশ করে চর্মের স্বাভাবিক রং ফিরিয়ে আনে। আপনি যদি বিভিন্ন ধরনের চিকিৎসা করার পরেও হতাশ বোধ করেন তাহলে আমাদের চিকিৎসা ১ বার পরীক্ষা করে দেখুন। রোগ বিবরণ লিখে বিনামূল্যে পরামর্শ বা পূর্ণ চিকিৎসার জন্য লিখুন। প্রয়োজনে সাক্ষাৎ করতেও পারেন।

পাকা চুল কালো

কলপে নয়, আমাদের আয়ুর্বেদিক তেল ব্যবহারে চুল পাকা ও ঝরা রোধ করে এবং পাকা চুলকে কালো করে। ইহা ব্যবহারে স্মরণ শক্তির বৃদ্ধি হয়। মস্তিষ্ক ও চোখের দুর্বলতা দূর করে। তিন শিশি এক কোর্স Rs. 60/- ডাক খরচ পৃথক।

SHRI AYURVEDIC PHARMACY (S.K)
P.O.KATRI SARAI (GAYA)

শিবু একদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে বিশাল সিন্দুকটার দিকে। নিঃশব্দে। সিন্দুকটাকে যেন দু-চোখ দিয়ে গিলছে ও!

বাপান কাছেই ছিল। সিন্দুকটাকে সে-ও অনেক দিন ধরে দেখছে। জন্মের পর থেকেই। কিন্তু সিন্দুকটার ভেতর কী আছে, তা আজও দেখা হয়নি ওর। ঠাকমাকে খুলতে বললে ঠাকমা বলেন, ওটা খুলতে নেই। যে খুলবে, লক্ষ্মীর অভিশাপে তারই সব্বনাশ হবে। বাবাকে খুলতে বললে বাবা বলেন, পাঁচ পুরুষ ধরে ওটা বন্ধ আছে। কেউ খোলেনি। ওই দেখ, ওটার গায়ে আটকানো পেতলের পাতের ওপর লেখা রয়েছে : অভিশপ্ত সিন্দুক। আর মাকে বলতে গেলে মা বলেন, তোকে বলেছি না, ওটা খোলার কথা কখনো মুখে আনবি না? কতবার বলতে হবে?

শিবু এই চাটুজ্জে বাড়ির ভৃত্য। সবে কাজে লেগেছে। বাপানকে দেখাশোনা করাই ওর কাজ। বাপানের বাবা মা দু-জনেই ডাক্তার। দু-জনেই চাকরি করেন কলকাতায়, সরকারী হাসপাতালে। অথচ বাড়িতে একমাত্তর বৃদ্ধা ঠাকমা ছাড়া বাপানের ওপর নজর রাখার মতন আর কেউ-ই নেই। ঠিক সময়ে স্কুল-বাসে উঠিয়ে দেওয়া, আবার সময় মতন সেখান থেকে নামিয়ে আনার জন্যে একজন বিশ্বস্ত লোক চাই-ই চাই। আগে যে কাজের লোকটা ছিল, সে একটা কারখানায় চাকরি পেয়ে যাওয়ায় একটা সাময়িক সমস্যা দেখা দিয়েছিল। বাপানের বাবা

অভিশপ্ত সিন্দুক

রাধারমণ রায়

তখন অনেককেই বলে রেখেছিলেন নতুন একটা কাজের লোক দেখে দেওয়ার জন্যে। শেষমেষ বাপানের বাবার এক ডাক্তার বন্ধু একটা চিঠি লিখে বাপানদের বাড়িতে পাঠিয়ে দেন শিবুকে। লোকটা নাকি খুবই বিশ্বাসী। তাছাড়া বাপানের বাবার বন্ধুরও খুব চেনাজানা!

বাপানের বাবার বন্ধু এখন যুক্ত আছেন কল্যাণীর নেহরু হাসপাতালে। সেখানেই কোয়ার্টারে থাকেন। শিবুর বাড়িও ওই কল্যাণীতেই।

বাপানের মা প্রথমে একটু আমতা আমতা করেছিলেন। কিন্তু বাপানের ঠাকমা বলেছিলেন, ও-ই থাকবে। নদে জেলার লোক খুব সৎ আর শান্ত হয়। এরপর আর কথা থাকতে পারে না। ছিলও না। শিবু সেদিনই চাটুজ্জে বাড়িতে লেগে গিয়েছিল কাজে। আজ নিয়ে মোট চার দিন ও কাজে লেগেছে।

শিবুকে সিন্দুকটার দিকে তাকিয়ে থাকতে দেখে বাপান বায়না ধরলো, শিবুদা, সিন্দুকটা একবার খোল। আমি ভেতরে কী আছে দেখবো।

একসেট চাবি সিন্দুকটার গায়ে লাগানোই ছিল। সেই মান্ধাতার আমল থেকে। না, ইনি সূর্যবংশীয় মান্ধাতা নন। ইনি হচ্ছেন চাটুজ্জেদের পূর্বপুরুষ।

বাপানের কথায় শিবু একটু চমকে উঠলো। তারপর নিজেকে সামলে নিয়ে বলে উঠলো, না, আমি খুলতে পারবো না।

সময় এগিয়ে চলে। এক-এক করে কেটে যায় কয়েকটা দিন। এর মধ্যে শিবুকে অনেকবারই সিন্দুকটার সামনে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেছে বাপান। যতবারই ও শিবুকে ওই অবস্থায় দেখেছে, ততবারই ও সিন্দুকটা খুলতে বলেছে শিবুকে। কিন্তু শিবু কিছুতেই রাজী হয়নি খুলতে।

বাপানদের বসবার ঘরে যে-কটি দেখবার জিনিস আছে, তাদের মধ্যে অভিশপ্ত সিন্দুকটা সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য। সিপাহি বিদ্রোহের পর মান্ধাতা চাটুজ্জে জমিদারি কিনেছিলেন খুলনা জেলায়। প্রতাপগড়ে বাড়ি করেছিলেন তিনি। বিশাল বাড়ি। সে-সময় বিলেত থেকে অর্ডার দিয়ে ওই সিন্দুকটা তিনি আনিয়েছিলেন। ওটা একটা বিশেষ দুর্লভ মডেলের সিন্দুক! ওই সিন্দুকটা যে-দিন আনা হয়, তার আগের রাত্তিরে মান্ধাতার স্ত্রীকে লক্ষ্মীদেবী স্বপ্নে বলেছিলেন, সিন্দুকটায় কিছু রেখো না। রাখলে সর্বনাশ হবে।

মান্ধাতার স্ত্রী স্বপ্নের কথা মান্ধাতাকে বলেছিলেন। কিন্তু মান্ধাতা তা গ্রাহ্য না করে যত টাকাপয়সা-গয়নাগাঁটি সব ওই সিন্দুকের মধ্যে পুরে একসেট চাবি নিজের কোমরের ঘুনসিতে বেঁধে রেখেছিলেন, আর ডুপ্লিকেট চাবির সেটটা নিজের হাতে বেঁধে দিয়েছিলেন স্ত্রীর আঁচলে।

সেই রত্তিরেই প্রতাপগড়ের চাটুজ্জে বাড়িতে ডাকাত পড়েছিল! ডাকাতরা মান্ধাতাকে খুন করে তার কোমরের ঘুনসি থেকে চাবির সেট-টা ছিঁড়ে নিয়ে খুলে ফেলেছিল সিন্দুকটা! তারপর সিন্দুকের সোনাদানা-টাকাপয়সা বের করে নিয়ে চলে যাওয়ার সময় চাবির সেট-টাও ভুল করে নিয়ে গিয়েছিল সংগে করে।

মান্ধাতা-গিন্নী এরপর আর বেশি দিন বাঁচেন নি। মৃত্যুর আগে তিনি তাঁর একমাত্তর সন্তান জগন্নাথকে নিষেধ করে যান সিন্দুকটা খুলতে। তার আগেই তিনি কী একটা ভেবে আঁচল থেকে ডুপ্লিকেট চাবির সেট-টা খুলে সেটা দিয়ে বন্ধ করে দিয়েছিলেন সিন্দুকটা। তারপর চাবিটাকেও আটকে রেখেছিলেন সিন্দুকের গায়ে। এর কিছুদিন বাদেই 'অভিশপ্ত সিন্দুক' লেখা পেতলের পাতটা সিন্দুকের গায়ে লটকে দিয়েছিলেন তাঁর ছেলে জগন্নাথ।

১৯৪৭ সালের ১৫ই আগস্ট ভারতবর্ষ ভাগ হওয়ার পর বাপানের ঠাকুরদা জনার্দন চাটুজ্জে 'অভিশপ্ত সিন্দুক'-টা নিয়ে এসে তুলেছিলেন তাঁর কলকাতার বাড়িতে। সেই থেকে সিন্দুকটা শোভাবর্ধন করে আসছে বাপানদের বসবার ঘরের।

সেদিনটা ছিল বৃহস্পতিবার। বাপানের স্কুল বন্ধ। দুপুরবেলা বাপান পড়ার ঘরে বসে সাপ্তাহিক পরীক্ষার পড়া তৈরি করছে, এমন সময় পড়ার ঘরের পাশেই বসবার ঘরে খুটখাট আওয়াজ পেয়ে চুপি চুপি উঠে এসে দাঁড়ালো ও ভেজানো দরজাটার সামনে। দরজাটা দু-ঘরের মাঝখানে। সেটার পাল্লা দুটো অল্প একটু ফাঁক করে ও দেখলো, শিবু সিন্দুকটা খুলছে। সিন্দুকটা ছিল দরজার সোজাসুজি ওপাশের দেয়ালের সংগে ছোঁয়ানো। শিবু দরজার দিকে পেছন ফিরে দাঁড়িয়েছিল বলে বাপানকে দেখতে পায়নি।

এ-ঘর থেকে বাপান স্পষ্ট দেখলো সিন্দুকের ভেতরটা ভোঁ ভোঁ! কিচ্ছু নেই সেখানে!

এরপর বাপান আর ওখানে দাঁড়ায়নি। সরে এসে বসে পড়েছিল পড়ার টেবিলে।

তিন দিন পরের ঘটনা। এদিনটা ছিল রবিবার। বাপানের বাবা-মা সকালে বাড়িতেই ছিলেন। এমন সময় ডি-সি-ডি-ডি সন্তোষ বিশ্বাস, টালিগঞ্জ থানার ও-সি বিনয় মজুমদার আর প্রখ্যাত প্রাইভেট ডিটেকটিভ গণেশ

হালদার এলেন বাপানদের বাড়িতে।

বাপানের বাবা ডক্টর জয়ন্ত চ্যাটার্জী জানতে চাইলেন, কী ব্যাপার?

সন্তোষ বিশ্বাস বললেন, ব্যাপার গুরুতর! আপনাদের বাড়িতে ইদানিং যে-লোকটা কাজে লেগেছে, তাকে একবার ডাকুন।

শিবুকে ডাকা হলো। তাকে দেখেই গণেশ হালদার বলে উঠলেন, হ্যাঁ, এই সেই লোক। একে আপনি কোথায় পেলেন?

জয়ন্তবাবু বললেন, আমার এক ডাক্তার-বন্ধু একে দিয়েছেন।

হতেই পারে না। তাঁকে টেলিফোন করুন। বললেন গণেশ হালদার।

জয়ন্তবাবুর বন্ধু ফি-শনিবার কলকাতার বাড়িতে আসেন। রবিবারটা থেকে আবার সোমবার সকালে চলে যান কল্যাণী। আজ রবিবার বলে তিনি বাড়িতেই ছিলেন। তাঁকে ফোন করে জয়ন্তবাবু জানতে পারলেন তিনি কোনো লোককেই পাঠাননি এ-বাড়িতে। এখনো তিনি লোক খুঁজছেন জয়ন্তবাবুর জন্যে!

গণেশ হালদার এবার শিবুর দিকে ডান হাতের তর্জনী তাক করে বলে উঠলেন, এই লোকটার আসল নাম তারকনাথ। আগে ও একটা নামকরা সিন্দুক কোম্পানিতে কাজ করতো। সেখানে একটা খারাপ কাজ করায় ওর চাকরি চলে যায়। পরে ও বেছে নেয় ব্যাংক-ডাকাতি পেশা।

আশ্চর্য! ও ব্যাংক-ডাকাত! জয়ন্তবাবুর মুখ দিয়ে বেরিয়ে এলো কথাগুলো।

হ্যাঁ, গত পরশু দুপুরে কালীঘাট স্টেট ব্যাংকে ওরই নেতৃত্বে ডাকাতি হয়। সে-সময় ব্যাংকের দশ লাখ টাকা

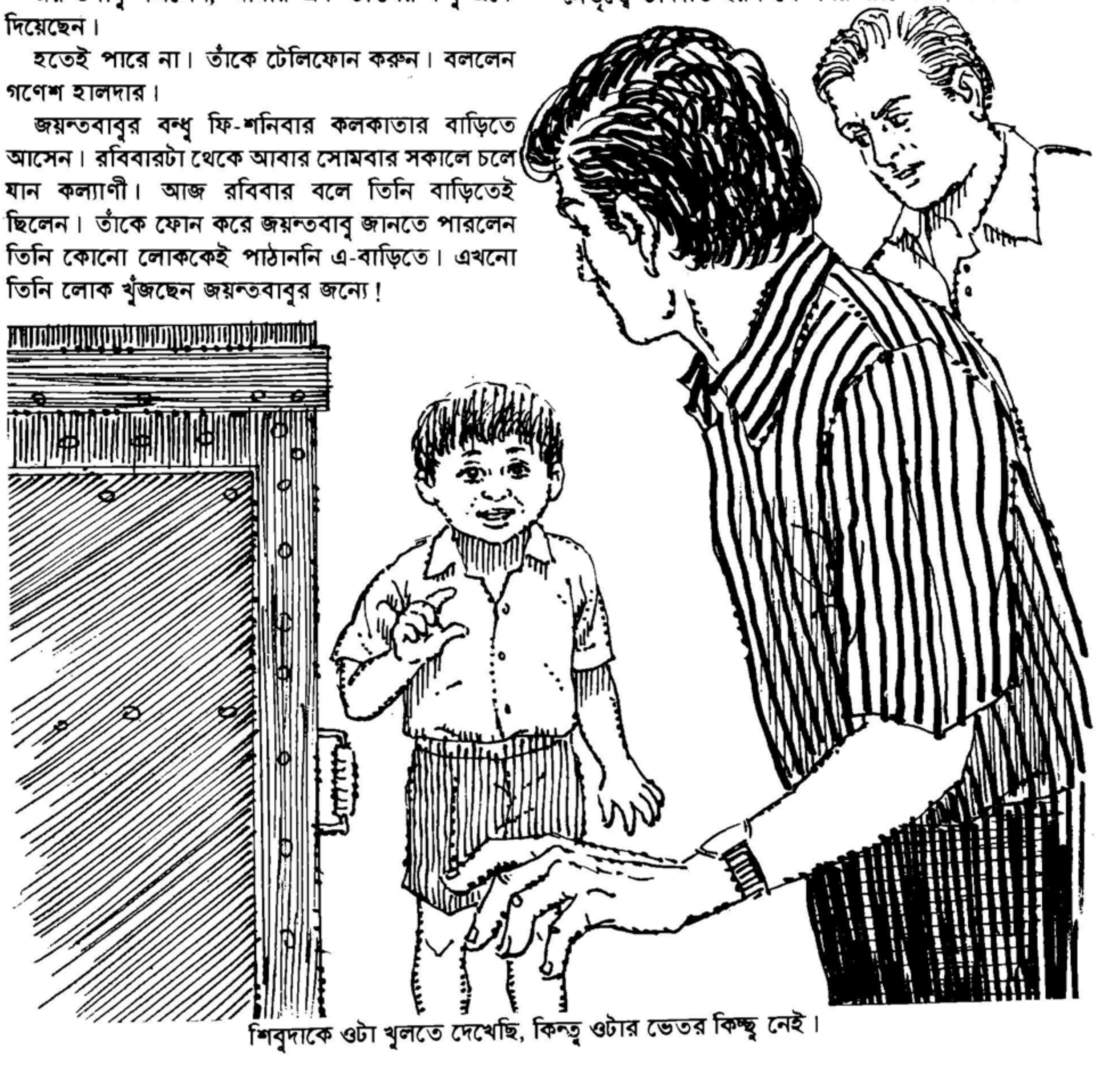

শিবুদাকে ওটা খুলতে দেখেছি, কিন্তু ওটার ভেতর কিচ্ছু নেই।

খোয়া যায়। আমাদের কাছে খবর আছে, সেই টাকা ও আপনার বাড়িতে নিয়ে এসে তুলেছে। বললেন সন্তোষ বিশ্বাস।

জয়ন্তবাবু বললেন, অসম্ভব। আমার বাড়িতে ও কোনো টাকা-পয়সা রাখেনি।

জয়ন্তবাবুর কথায় কেউ আমলই দিলেন না। তল্লাসি আরম্ভ হলো। কিন্তু লুঠের নোট একটাও পাওয়া গেল না। কোনো ঘরেই না। সবাই এরপর ফিরে এলেন বসবার ঘরে।

গণেশ হালদারের হঠাৎ চোখ পড়লো সিন্দুকটার ওপর। উনি জয়ন্তবাবুকে শুধোলেন, এটার মধ্যে কী আছে ?

জয়ন্তবাবু বললেন, কিচ্ছু নেই। পাঁচ পুরুষ ধরে ওটা খোলা হয় না।

গণেশ হালদার চাবির সেট আর চাবি লাগানোর ছিদ্রটা পরীক্ষা করলেন সিন্দুকটার কাছে এগিয়ে গিয়ে। তারপর বললেন, কিন্তু ভেরি রিসেণ্টলি এটা খোলা হয়েছিল দেখছি !

বাপান এ-ঘরেই ছিল। গণেশ হালদারের কথা শেষ হতেই ও বললো, হ্যাঁ, শিবুদাকে ওটা খুলতে দেখেছি। কিন্তু ওটার ভেতর কিচ্ছু নেই।

কিচ্ছু নেই ! তুমি ঠিক জান এর ভেতর কিচ্ছু নেই ?

আমি নিজের চোখে দেখেছি।

তাহলে তোমাকে একটা ম্যাজিক দেখাই। তারক, তুমিও দেখ। না, না, পালানোর চেষ্টা করো না। বাইরে পাহারা বসানো আছে। তারক ওরফে শিবুর দিকে তাকিয়ে কথাগুলো শেষ করেই গণেশ হালদার চাবি ঘুরিয়ে সিন্দুকটা খুলে ফেললেন।

ম্যাজিকই বটে ! না হলে খালি সিন্দুকটার মধ্যে এতগুলো নোটের তাড়া এলো কোত্থেকে ! গুনে দেখা গেল একশোটা বাণ্ডিল আছে ! প্রতিটি বাণ্ডিলে আছে একশোটা করে একশো টাকার নোট ! তার মানে, মোট দশ লাখ টাকা ! কালীঘাট ব্যাঙ্কের লুঠ হওয়া দশ লাখ টাকাই এখানে তোলা আছে !

ও-সি বিনয় মজুমদার হুইস্‌ল বাজিয়ে দু-জন কনস্টেবলকে ডাকলেন। তারা এসে তারক ওরফে শিবুর হাতে পরিয়ে দিল হাতকড়া।

গণেশ হালদারের ম্যাজিক দেখে অবাক হয়ে গেলেন বাপানের মা-বাবা। বাপান তো আরো অবাক হলো। চোখে দেখেও বিশ্বাস করতে পারছে না ব্যাপারটা !

গণেশ হালদার ব্যাপারটাকে এ-ভাবে ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে দিলেন : এ-বাড়িতে যে একটা খালি সিন্দুক আছে, একথা আগেই জানতে পেরেছিল তারক ওরফে শিবু। পুরোনো ভৃত্যের কাজ ছেড়ে দিয়ে চলে যাওয়ার কথাও ও জানতে পারে। ও তখন একটা জাল চিঠির সাহায্যে এ-বাড়িতে কাজ নেয়। সাময়িক ভাবে লুঠের নোটগুলো লুকিয়ে রাখার পক্ষে ওই সিন্দুকটাই ছিল সবচেয়ে নিরাপদ জায়গা। ব্যাংক-লুঠের পরিকল্পনাটা আগেই ওর ছকা ছিল। নির্দিষ্ট দিনে দুপুরবেলা বাড়ি থেকে বেরিয়ে গিয়ে কাজটা সেরে আবার ও চলে আসে এখানে। পুলিশ ওকে খুঁজছিল হন্যে হয়ে। শেষে গণেশ হালদারের মারফত একটা সূত্র পেয়ে তারা চলে আসে এ-বাড়িতে। পুলিশের চোখকে ফাঁকি দিতে পারলেও গণেশ হালদারের চোখকে ফাঁকি দেওয়া সম্ভব হয়নি ওর পক্ষে।

বাপানের ঠাকুমার ব্যাখ্যাটা অবশ্য অন্য রকম। ওঁর মতে অভিশপ্ত সিন্দুকটা খুলেছিল বলেই তারক ওরফে শিবু এত সহজে ধরা পড়েছিল পুলিশের হাতে ! আসলে অভিশপ্ত সিন্দুকটাই পুলিশকে ডেকে এনেছিল এ-বাড়িতে !

বাপানের মনে হলো দুটো ব্যাখ্যাই ঠিক।

ছবি : দিলীপ দাস

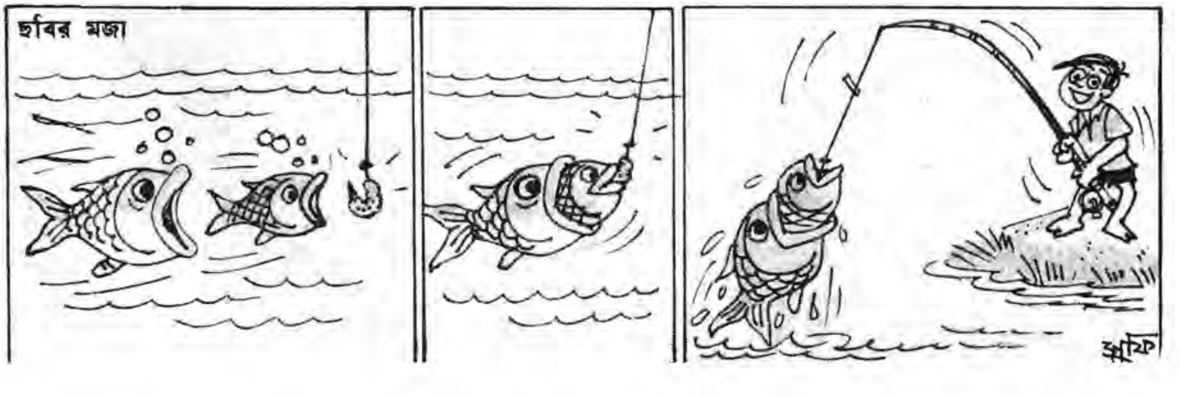

একটি কামধেনুর জন্যে

দোলগোবিন্দ মুখোপাধ্যায়

মহর্ষি বিশ্বামিত্র জীবনের পূর্বভাগে মহাবলশালী ক্ষত্রিয় রাজা ছিলেন। জেদের বশবর্তী হয়ে পরবর্তী জীবনে তিনি কঠোর তপস্যার দ্বারা ক্ষত্রিয় থেকে কেমন করে ব্রাহ্মণত্ব অর্জন করেছিলেন সে সম্পর্কে একটি সুন্দর গল্প আছে।

বিশ্বামিত্র তখন প্রবল পরাক্রান্তশালী রাজা। ধর্মশীল ও প্রজাবৎসল হিসাবেও তাঁর খ্যাতি ছিল। তাঁর পূর্বপুরুষ ছিলেন মহীপাল কুশ; ভগবান প্রজাপতির পুত্র। কাজেই পূর্বপুরুষের দৈবীশক্তিরও তিনি অধিকারী ছিলেন।

একবার মহারাজা বিশ্বামিত্র স্থির করলেন, চতুরঙ্গ সেনাসহ পুত্রদের নিয়ে তিনি পৃথিবী পরিভ্রমণে বেরবেন। সেকালে এমনই ছিল। রাজ্যে যখন সুখ ও শান্তি বিরাজমান, পৃথিবীর অন্যান্য অধিপতিরাও যখন রাজাকে শ্রেষ্ঠ জ্ঞানে তাঁর আধিপত্য স্বীকার করে নিতেন, তখনই রাজা এমনভাবে রাষ্ট্রে রাষ্ট্রে পরিভ্রমণে বার হতেন। সকলের আতিথ্য স্বীকার করে তাঁদের আনুগত্যের পরিচয় নিতেন।

মহারাজা বিশ্বামিত্র এইভাবে পরিভ্রমণে বেরিয়ে অনেক নদ-নদী, পাহাড়-পর্বত অতিক্রম করে, এক রাষ্ট্র থেকে আর এক রাষ্ট্রের আতিথ্য নিয়ে অবশেষে এসে পৌঁছলেন মহর্ষি বশিষ্ঠদেবের তপোবন আশ্রমে। তপোবনে বশিষ্ঠদেবের আশ্রম দেখে বিশ্বামিত্র মোহিত হয়ে গেলেন। সত্যিই অপূর্ব শোভামণ্ডিত নন্দনকানন! চারিদিকে গভীর অরণ্যবেষ্টিত তপোবনে ফলফুলের সমাহার! পাহাড়-পর্বত বেষ্টন করে কুলুকুলু প্রবহমানা স্রোতস্বিনী ও নির্ঝরণী। নির্ভয়ে বিচরণরত হরিণ-হরিণী, ময়ূর-ময়ূরী ও জানা-অজানা অসংখ্য পক্ষীকুল। তারই মাঝে নিরুপদ্রবভাবে কঠোর আধ্যাত্মিক চর্চায় মগ্ন মহামুনি, তপস্বিগণ। মহারাজা বিশ্বামিত্রের কাছে তপোবনকে দ্বিতীয় স্বর্গরাজ্য বলে মনে হতে লাগল।

মহারাজের আগমন-বার্তায় স্নিগ্ধ শান্ত তপোবনে ক্ষণিক চাঞ্চল্য উপস্থিত হলো। মহর্ষি বশিষ্ঠদেব মহা আনন্দে মহারাজা বিশ্বামিত্রকে অভ্যর্থনা করলেন। বিশ্বামিত্রও উদ্বেলিত হৃদয়ে বশিষ্ঠদেবকে প্রণাম করে কুশলবার্তা নিলেন।

বশিষ্ঠদেব বললেন, মহারাজ, আপনার আগমনে আমি ও আমার আশ্রমবাসী সকলে মহা আনন্দিত ও কৃতার্থ হয়েছি। আপনি মহাপরাক্রান্ত ও প্রজানুরাগী রাজা। আপনার ধর্মপরায়ণতাও সারা বিশ্বে প্রশংসালাভ করেছে। আপনার যথাযোগ্য সমাদর করাই এখন আমার একমাত্র কর্তব্য। আপনি পুত্রগণসহ সৈন্যসামন্ত নিয়ে আমার আতিথ্য গ্রহণ করুন।

বিশ্বামিত্র মহাতপস্বী বশিষ্ঠদেবের অভ্যর্থনায় খুবই খুশি হলেন। কিন্তু তিনি যথেষ্ট বিবেচক। আশ্রমবাসী দীন তপস্বিগণকে তিনি অহেতুক ব্যতিব্যস্ত করতে চাইলেন না। তাঁর সঙ্গে রয়েছে কয়েক সহস্র সৈন্যসামন্ত ও পরিচারকমণ্ডলী। সকলের আহার-বিহার ও আতিথেয়তার ভার গ্রহণ করা সহজ কথা নয়। তিনি বশিষ্ঠদেবকে বললেন, তাপসশ্রেষ্ঠ, আপনি অযথা ব্যস্ত হবেন না। আপনি যে ভাবে

যথাযোগ্য মর্যাদায় আমার সমাদর করেছেন, তাতেই আমি পরিতৃপ্ত। আপনার আশ্রম দর্শন করার পর আমি সত্যিই নিজেকে ভাগ্যবান বলে মনে করছি। এখন আমরা চললাম। প্রণাম নিন।

কিন্তু বশিষ্ঠদেব কিছুতেই অতিথি বিশ্বামিত্রকে চলে যেতে দিতে চাইলেন না। অনেক অনুনয়-বিনয়ের পর বিশ্বামিত্র আশ্রমে আতিথ্য নিতে স্বীকৃত হলেন বটে, কিন্তু মনে মনে ভাবলেন, এতগুলি মানুষের আহারের আয়োজন করা বশিষ্ঠদেবের পক্ষে কি করে সম্ভব? এ যে মহাযজ্ঞের আয়োজন! বশিষ্ঠদেব বিশ্বামিত্রের এই দ্বিধাগ্রস্ততার কারণ অনুমান করেছিলেন। তাই তিনি মৃদুহাস্যে বললেন, আহার-বিহারের আয়োজন করা কিছুই কঠিন হবে না মহারাজ। সে সম্বন্ধে আমি সম্পূর্ণ চিন্তামুক্ত। দ্বিধা করবার কোনো কারণ নেই। এই দেখুন—

বলেই বশিষ্ঠদেব মিষ্টস্বরে ডাকলেন, শবলা!

সংগে সংগে 'হাম্বা' 'হাম্বা' রবে ডাকতে ডাকতে একটি সুন্দরবর্ণের পরিপুষ্ট গাভী এসে দাঁড়াল। বশিষ্ঠদেব তাকে উদ্দেশ করে বললেন, শবলা! এই দেখ, মহারাজ বিশ্বামিত্র সপুত্র ও সসৈন্য আমার আতিথ্য গ্রহণ করে আমাকে ধন্য করেছেন। মহারাজসহ সকলকে পরিতৃপ্ত করতে যত রকম খাদ্য ও পানীয় প্রয়োজন সে সকল যত শীঘ্র সম্ভব তুমি সৃষ্টি কর! মহারাজকে পরিতুষ্ট কর!

শবলা বশিষ্ঠদেবের কামধেনু। বশিষ্ঠদেব আদেশ করা মাত্রই শবলা স্বর্ণময় অসংখ্য ভোজনপাত্রসহ রাশি রাশি সুস্বাদু খাদ্য-দ্রব্য সৃষ্টি করল। কয়েক সহস্র মানুষ পরম তৃপ্তিতে আহার করার পর এবং নিজেও পরিতৃপ্ত হয়ে বিশ্বামিত্র বশিষ্ঠদেবকে ধন্য ধন্য করতে লাগলেন। শবলা গাভীর অলৌকিক ক্ষমতা দেখে তিনি বিস্মিত হয়েছিলেন। শবলা তাঁর মনোহরণ করে নিলে। এমন একটি গাভী যাঁর সহায়, ইহলোকে তাঁর চাওয়ার আর কিছু থাকতেই পারে না। গাভীটির প্রতি লোভ হলো তাঁর। অনেক দ্বিধাদ্বন্দ্বের পর বশিষ্ঠদেবকে তিনি মনের ইচ্ছা ব্যক্ত করে বললেন, মহর্ষি! আমার একটি বিশেষ ইচ্ছা আপনি পূরণ করুন। আপনাকে আমি আশ্রমের উপযুক্ত কয়েক সহস্র গাভী দিচ্ছি, আপনি তার পরিবর্তে শবলাকে আমায় দান করুন।

মহর্ষি বশিষ্ঠদেব মহারাজা বিশ্বামিত্রের এই অকল্পনীয় অনুরোধ শুনে কয়েক মুহূর্ত থমকে গেলেন। তারপরে বললেন, মহারাজ! সহস্র গাভীই হোক, আর লক্ষ গাভীই হোক—কোনো কিছুর পরিবর্তেই আমি শবলাকে পরিত্যাগ করতে পারব না। শবলাই আমার একমাত্র আশ্রয়দাত্রী। আমার যাবতীয় ক্রিয়াকর্ম, যাগযজ্ঞ, আমার সকল জীবনযাত্রাপ্রণালী এই শবলা গাভীকে আশ্রয় করেই নিষ্পন্ন হয়ে থাকে। বিবিধ দৈবী-বিদ্যাও এর আয়ত্তে। কাজেই তাকে প্রদান করা আমার পক্ষে কখনই সম্ভব নয়।

পূজা বার্ষিকী

নবপত্রিকা	২০.০০	সোনার ঝাঁপি	১২.০০
অপরূপা	২০.০০	আরাধনা	৩২.০০
দেবায়ন	১৫.০০	বিভাবরী	২৪.০০
বোধন	১৫.০০	ভূত পেত্নী রক্ত চোষা	২০.০০
হলদে মুখোস	১৬.০০	গল্প ভাল আবার বল	১৮.০০
বিশ্বের শ্রেষ্ঠ গল্প	২০.০০	ছবিতে অ্যাড্‌ভেঞ্চার	১২.০০
গল্প হলেও গল্প নয়	১২.০০	রোমাঞ্চকর চিত্র কাহিনী	১২.০০
সোনার কাঠি রূপোর কাঠি	১২.০০	ঠাকুরমার ঝুলি	১৮.০০
কনক চাঁপা	১২.০০	বরণডালা	৬.০০

দেব সাহিত্য কুটীর প্রাঃ লিঃ ২১, ঝামাপুকুর লেন, কলি-৯

ব্রহ্মতেজের ক্ষমতা দেখে বিশ্বামিত্রের গর্ব চূর্ণ হলো।

বিশ্বামিত্র বশিষ্ঠদেবের কোনো কথাতেই কর্ণপাত না করে অনুনয়-বিনয় করতে লাগলেন শবলাকে তাঁর হাতে দেওয়ার জন্যে। বললেন, মহর্ষিপ্রবর! এই শবলা গাভী রত্নতুল্য। রত্নে একমাত্র রাজারই অধিকার। কাজেই আপনি দ্বিধাহীনভাবে রাজহস্তে এই অমূল্য সম্পদ তুলে দিয়ে কর্তব্যকর্ম পালন করুন। আপনি চাইলে তার পরিবর্তে অজস্র মণিমুক্তা, এক কোটি গাভী এবং আপনি যা যা প্রার্থনা করেন, সবই দিতে রাজী আছি।

বশিষ্ঠদেব তবু অনড়, অটল। কোনো কিছুর পরিবর্তেই তিনি শবলাকে ছাড়তে রাজী নন। তাই দেখে মহারাজ বিশ্বামিত্র শেষ পর্যন্ত বলপ্রয়োগে শবলা গাভীকে সৈন্য পরিবেষ্টিত করে সংগে নিয়ে চললেন। শবলা স্বেচ্ছায় আশ্রম ত্যাগ করতে চাইল না। মহর্ষি বশিষ্ঠদেবকে ছেড়ে থাকা তার পক্ষেও সম্ভব নয়। কিছুদূর যাওয়ার পর শবলা বিশ্বামিত্রের সৈন্যসামন্তদের হাত থেকে নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে ছুটতে ছুটতে পালিয়ে এল। সজল-নয়নে বশিষ্ঠদেবকে অনুযোগ করলে, আচার্য, কেন আপনি আমাকে বিনা কারণে অপরের হস্তে প্রদান করছেন? আপনাকে ছেড়ে আর কোথাও আমার থাকা সম্ভব নয়।

বশিষ্ঠদেবও এমন ঘটনায় কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়েছিলেন। তিনি কেমনভাবে অতিথির অসম্মান না করে শবলাকে অধিকারে রাখবেন, চিন্তা করতে পারছিলেন না। তাছাড়া বিশ্বামিত্র বলশালী ক্ষত্রিয় রাজা, তাঁর অনেক সৈন্যসামন্ত এবং তিনি দৈবী অস্ত্রতেজে বলীয়ান। বশিষ্ঠদেব নিজেকে সেই তুলনায় অনেক ক্ষুদ্র ভাবলেন। শবলাকে বললেন, শবলা, আমি তোমাকে স্বেচ্ছায় পরিত্যাগ করছি না। আমি তোমাকে নিজের অধিকারে রাখতে অপারগ হয়েই মহারাজ বিশ্বামিত্রের হাতে ছেড়ে দিতে বাধ্য হচ্ছি।

শবলা বললে, মহর্ষি, আপনি নিজেকে শক্তিহীন ভেবে আমায় এমনভাবে পরিত্যাগ করবেন না। ক্ষত্রিয় বিশ্বামিত্র আপনার অপেক্ষা কোনোভাবেই বলশালী নয়। আপনি ব্রাহ্মণ। ব্রহ্মতেজ অপেক্ষা কোনো তেজই শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করতে পারে না। আপনি আদেশ করুন। আপনার তেজে বলীয়ান হয়ে আমি অসাধ্যসাধন করতে পারি।

শবলার দীপ্ত কথায় বশিষ্ঠদেব নববলে বলীয়ান হয়ে তাকে আদেশ করলেন, দুরাচারী বিশ্বামিত্রের সৈন্যসামন্তকে ধ্বংস করতে অবিলম্বে অসংখ্য সৈন্য সৃষ্টি কর!

শবলাও আদেশ পাওয়া মাত্র 'হাম্বা' 'হাম্বা' রব তুলে অগণিত সৈন্য সৃষ্টি করে বিশ্বামিত্রের সহস্র সহস্র সৈন্য নিমেষে ধ্বংস করে দিল। মহারাজ বিশ্বামিত্র এই দৃশ্য দেখে ক্রোধে ফেটে পড়লেন। নতুন নতুন দৈব অস্ত্র প্রয়োগে শবলার সব সৈন্য নিপাত করলেন তিনি। শবলাও মহাতেজে উদ্দীপিত হয়ে আরও ভয়ংকর বলশালী অসংখ্য সৈন্য সৃষ্টি করতে লাগল। বিশ্বামিত্রের সৈন্যরা আকুল হয়ে ছত্রভংগ হয়ে পড়লে বিশ্বামিত্রও তাদের বিনাশ করতে লাগলেন নতুন নতুন অস্ত্রপ্রয়োগে। মহর্ষি বশিষ্ঠদেব শবলাকে আদেশ করলেন আরও–আরও অসংখ্য সৈন্য সৃষ্টি করতে। আদেশ পাওয়া মাত্র শবলার প্রতিটি লোমকূপ থেকে, প্রতিটি নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস থেকে পূর্বের চেয়েও শক্তিশালী সৈন্য সৃষ্টি হতে লাগল। মহারাজ বিশ্বামিত্রের সৈন্যসামন্ত তাদের কাছে

সম্পূর্ণ পরাস্ত হয়ে গেলে বিশ্বামিত্রের পুত্রেরা অস্ত্রধারণ করে বশিষ্ঠকে আক্রমণ করতে উদ্যত হলো। বশিষ্ঠদেব তাই দেখে প্রবল এক হুংকার ছাড়লেন আর সংগে সংগে বিশ্বামিত্র-পুত্রেরা ভস্মীভূত হয়ে গেল। পুত্রেরা নিহত হলে মহারাজ বিশ্বামিত্র একেবারে ভেঙে পড়লেন। একটি মাত্র পুত্র তাঁর জীবিত ছিল। বিষণ্ণ হৃদয়ে তার হাতে রাজ্যভার অর্পণ করে তিনি বনবাসী হলেন।

বশিষ্ঠদেবের হাতে পরাজয়ের শোধ নিতে বিশ্বামিত্র নির্জন অরণ্যে গভীর তপস্যায় মগ্ন হলেন। তপস্যায় সিদ্ধিলাভ করে মহাদেবের কাছে বর প্রার্থনা করলেন, দেব, দানব, যক্ষ, রক্ষ, গন্ধর্ব ও মহর্ষিলোকে যত উৎকৃষ্ট অস্ত্র আছে সবই যেন তাঁর আয়ত্তে হয়।

মহাদেব "তথাস্তু" বলে অন্তর্ধান করলেন।

বিশ্বামিত্র মহাদেবের বরে দিব্য-অস্ত্র লাভ করে বশিষ্ঠদেবকে ধ্বংস করবার জন্যে হুংকার ছাড়তে ছাড়তে তপোবনে প্রবেশ করলেন এবং নিমেষে তপোবনকে ভস্মীভূত করলেন। আশ্রমবাসী মুনি-তপস্বিগণ যে যেখানে ছিলেন প্রাণভয়ে পালালেন, তপোবন-আশ্রিত পশুপক্ষীরা আর্তস্বরে চিৎকার তুলে অরণ্য ত্যাগ করল। বশিষ্ঠদেব তাঁর স্বর্গতুল্য প্রাচীন আশ্রমের এই নিদারুণ অবস্থা দেখে ক্রোধে প্রজ্বলিত হয়ে বিশ্বামিত্রের প্রতি অভিশাপ বর্ষণ করতে লাগলেন। অভিশাপের তেজে চতুর্দিকে অগ্নিবৃষ্টি শুরু হলো। বিশ্বামিত্র তাঁর দিব্য-অস্ত্রগুলি একে একে বশিষ্ঠদেবের প্রতি নিক্ষেপ করতে লাগলেন। বশিষ্ঠদেবও ক্রুদ্ধ হয়ে নিজস্ব ব্রহ্ম-ক্ষমতা প্রয়োগ করে বিশ্বামিত্রের সব অস্ত্র নিমেষে নিস্তেজ করে দিলেন। ব্রহ্মতেজের ক্ষমতা দেখে স্বর্গ থেকে দেবতারা ধন্য ধন্য করতে লাগলেন। বিশ্বামিত্র নিষ্প্রভ ও বিষণ্ণ হৃদয়ে দেখলেন, ব্রহ্মণ্য তেজকে কোনোক্রমেই ক্ষত্রিয় তেজ দ্বারা ধ্বংস করা সম্ভব নয়। এতদিন ক্ষত্রিয় বংশজাত বলে বিশ্বামিত্রের মনে যে অহংকার ও গর্ব ছিল তা চূর্ণ হলো এইভাবে।

তিনি প্রতিজ্ঞা করলেন, বশিষ্ঠের সমান ব্রহ্মতেজ তাঁকে লাভ করতেই হবে। যতদিন না তা সম্ভব হয়, ততদিন তিনি তপস্যা করবেন।

বহু সহস্র বৎসরের কঠিন সাধনায় তিনি অভীষ্ট লাভে সমর্থ হয়েছিলেন। ব্রহ্মার বরে তিনি ব্রাহ্মণত্ব অর্জন করেছিলেন।

ছবি: সরোজ সরকার

ডায়েরি রাখলে কি হয়?

- শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের মুখ-নিঃসৃত বাণী শ্রীম তাঁর ডায়েরিতে লিখে রেখেছিলেন বলেই তো আমরা পেয়েছি শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত।
- ডায়েরি দেখে অতীতের ঘটনার কথা বললে সকলেই তা বিশ্বাস করেন।
- নিয়মিত ডায়েরি লিখলে সাহিত্যিক হওয়া যায়।
- এখনকার ডায়েরি ভবিষ্যতে গল্প উপন্যাস লিখতে সাহায্য করে।
- ডায়েরি নষ্ট স্মৃতি পুনরুদ্ধার করে।
- নিজের অগ্রগতির সন্ধান ডায়েরির মাধ্যমেই পাওয়া যায়।
- রোজ ডায়েরি লিখলে একাগ্রতা বাড়ে।
- ব্যবসা সুশৃংখলভাবে চালাতে ডায়েরি লেখা নানাভাবে সাহায্য করে।
- ডায়েরি লিখলে ছোটদের ভাষার ওপর দখল এসে যায়
- ডায়েরি লেখার আরও অনেক সুফল আছে।

DEV'S DIARY 1987

এখন থেকেই সকলের ডায়েরি লেখার অভ্যাস করার দরকার। সেই জন্যেই আমরা খুব সুন্দর করে Dev's Diary 1987 তৈরি করেছি।

দেবসাহিত্য কুটীর (প্রাঃ) লিঃ
২১, ঝামাপুকুর লেন, কলকাতা-৯

স্টার ট্রেক

রন হ্যারিস ও শ্যারমান ডিভোনো

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

সাট্‌ল্‌ স্পেসশিপটার ওপর থেকে লক্ষ্য সরিয়ে নেবার জন্যে এন্টারপ্রাইস ধীরে ধীরে কক্ষপথের বাইরে চলে যাচ্ছে.....
....তখন কিজিনটি যুদ্ধ-জাহাজ স্লাড ন্যাটে
আমাদের পার্টিকলবিম কামানগুলিই শুধু এন্টারপ্রাইসকে ঘায়েল করতে পারে...
...যদি অবশ্য জায়েন্ট কিলার যুদ্ধজাহাজটা এসে পৌঁছয়!
তখন সাট্‌লের মধ্যে...
কিজিনটি দেখছি তাদের আক্রমণ ব্যূহের দিকে এগিয়ে যেতে দিচ্ছে আমাদের ....
সলু, ওপরের দিকটাতেই গুলি চালাতে থাক আমরা রেহাই পেয়েও যেতে পারি!
কিন্তু...
দু...
...উ...ম...
দু...ম...
কিজিনটির পার্টি-কিলবিম কামানের আঘাতে সাট্‌লটা মিমিটের দিকে ঘুরপাক খেতে খেতে পড়ে যেতে লাগলো।
All Rights Reserved Dist by L.A. Times Synd © 1982 Paramount Pictures Corp
ক্যাপ্টেন...সব গেলো.. আমাদের অস্ত্রশস্ত্র থেকে আলাদা হয়ে গেলাম...কী হবে.....

যাদুর দেশে টারজান

সব্যসাচী

হঠাৎ বহুদূর থেকে ভেসে এল দু'টো ক্ষীণ আওয়াজ। এ-আওয়াজ তো রাইফেল ছাড়া অন্য কিছুর হতে পারে না।

"যাঃ ওরাই কেউ জিতল বাজি"–বলে উঠল এমরেল্ডা।

"না, মেমসাহেব, না "– তার কানের কাছে ফিসফিস করে কথা কইছে তার বন্দুকবাহী ঠিক সেই মুহূর্তে–"দেখুন, ঐ যে সিম্বা—"

যেদিকে আংগুল দেখাচ্ছে বন্দুকবাহী এমরেল্ডা তৎক্ষণাৎ তাকাল সেই দিকে। ঠি–ই–ক ! লম্বা লম্বা ঘাসের ভিতরে সম্পূর্ণ দেহটা লুকিয়ে রেখে একটা বিশাল মাথা জেগে আছে শুধু, নিষ্পলক চোখের দৃষ্টি তারই উপরে নিবদ্ধ রেখে। জন্তুটা মাত্রই শো-খানিক গজ দূরে। কিন্তু তাতে বিশেষ লাভ হচ্ছে না। এমরেল্ডা দেখতে পাচ্ছে শুধু তার মাথাটা। তাক করবার পক্ষে প্রশস্ত জিনিস নয়। মুখোমুখি গুলিতে জানোয়ার কদাচিৎ ঘায়েল হয়, তা জানে এমরেল্ডা। গুলির শব্দে ও শুধু রেগে যাবে দারুণ রকম,কালবিলম্ব না করে করবে আক্রমণ।

এমরেল্ডা বন্দুকবাহীকে ফিসফিস করে বললো–"ওর দিকে একদম তাকিয়ো না। যেন আমরা ওকে দেখিইনি, এমনি একটা ভাব দেখাও। আর চেষ্টা কর, আস্তে আস্তে ওর পাশের দিকে যেতে।"

এইবার এমরেল্ডা এগুচ্ছে সমুখে। ঠিক সিংহের দিকে নয়। একটুখানি ডাইনের দিক ঘেঁষে।

সিংহ ? সে নিশ্চল।

কিন্তু ধড়টা নিশ্চল হলেও তার হলদে সবুজ চোখের দৃষ্টি ক্রমাগত এদিকে আর ওদিকে ঘুরছে, এমরেল্ডার প্রতি পদক্ষেপের অনুসরণ করে করে। ওরাও চালাকি কম জানে না। দুশমনের অস্তিত্বই যেন তারা টের পায়নি। ভাব দেখাচ্ছে এমনিতরো।

এইভাবে একটু একটু করে এগিয়ে সিংহের থেকে পঞ্চাশ গজের মধ্যে ওরা এসে পড়ল। আর তারপরেই মুখোমুখি দাঁড়িয়ে পড়ল শিকারের। সিংহ তবু নিশ্চল; নিষ্পলক চক্ষে নিরীক্ষা করছে এমরেল্ডাকে।

এইবার কয়েক পা সোজা এগিয়ে গেল এমরেল্ডা আর অমনি বিশাল বিশাল দাঁত বার করে সিংহ গরগর গর্জে উঠল নীচু গলায়।

"ওটা একটু উঠে দাঁড়ালে ভালো হতো যে!"–বলছে এমরেল্ডা। বন্দুকবাহী একটুকরো পাথর কুড়িয়ে নিয়ে সিংহের দিকে ছুঁড়ে মারল। তার ফল সেই মুহূর্তেই পাওয়া গেল, পাওয়া গেল নীল আকাশের বিজলী-ঝলকের মতোই।

এক আকাশ-ফাটানো নাদের সঙ্গে সঙ্গে উঠে দাঁড়ালো পশুরাজ, করলো আক্রমণ।

"গুলি! গুলি! মেমসাহিব!"

এমরেল্ডা এক হাঁটু পেতে মাটিতে বসে পড়ল, চালিয়ে দিল গুলি। সিংহ উর্ধ্বমুখী এক লাফে শূন্যে উঠে গিয়েছে ততক্ষণ। অরণ্য পর্বতের নৈঃশব্দ খান খান হয়ে ভেঙ্গে পড়ছে তার গর্জনে গর্জনে।

গুলিটা সিংহের গায়ে বিঁধেছে বটে, কিন্তু তাকে থামাতে পারেনি। একবার চিৎ হয়ে পড়ে গেল ঠিকই কিন্তু দুই একবার গড়াগড়ি দিয়েই লাফিয়ে উঠল আবার, আর এমরেল্ডার দিকে ধেয়ে এল ঝড়ের বেগে। আবার গুলি করল এমরেল্ডা এবার তা ফসকে গেল। সঙ্গে সঙ্গে বন্দুকবাহী ঘোড়া টিপল তার নিজের বন্দুকের। যাঃ, কার্তুজটা ফায়ার হলো না। খুট করে একটু আওয়াজ। ব্যস, আর কিছু না।

এদিকে সিংহ তখন এমরেল্ডার উপরেই, বলতে গেলে। সে বেঁচে গেল শুধু বন্দুকবাহীর নির্বুদ্ধিতার দরুন। তার বন্দুকটা ফায়ার হয়নি। সে ঘাবড়ে গিয়েছে অতিমাত্র। এইবার সে পিছন ফিরে টেনে দৌড় দিল। সিংহের স্বভাব হলো এই যে কাউকে পালাতে দেখলে সে সব ছেড়ে তারই পেছনে ধাবিত হবে। তার এই স্বভাবের কল্যাণেই বহু শিকারী অনেক সময় প্রাণে বেঁচেছে।

এ-সিংহটা এমরেল্ডার ঘাড়ে পড়তেই যাচ্ছিল, এমন সময় পলায়মান বন্দুকবাহীর দিকে নজর পড়ল তার। অমনি এমরেল্ডাকে ত্যাগ করে সে ধাবিত হলো বন্দুকবাহীর পশ্চাতে। এমরেল্ডাও তক্ষুণি গুলি চালালো আবার সে-গুলি বিঁধলোও সিংহের গায়ে। কিন্তু রোষে যন্ত্রণায় অধীর জানোয়ারটাকে তখন থামায় কে? সে পিছনের দু পায়ে খাড়া হয়ে উঠে দাঁড়ালো, আর বন্দুকবাহীকে জড়িয়ে ধরল সমুখের দু পা দিয়ে। অভাগার মাথাটা গোটাই ঢুকে গেল তার বিশাল বিশাল দুই পাটির দাঁতের ফাঁকে। মট করে একটু আওয়াজ হলো শুধু, মগজের ঠিক মাঝখানে।

এমরেল্ডা এই বিভীষিকা দেখে ভয়ে প্রায় হতজ্ঞান। নিশ্চল, নিস্পন্দ হয়ে তাকিয়েই আছে শুধু। ভাগ্য ভালো তার, সিংহের দৃষ্টি তখন আর তার উপর নেই। বন্দুকবাহীটার ধড় নিয়ে কয়েক মুহূর্ত নাড়াচাড়া করল সে। তারপর অবসন্ন হয়ে গড়িয়ে পড়ল সেই দেহেরই উপরে। এমরেল্ডার দুটো গুলি ব্যর্থ হয়নি, মরেছে সিংহ।

পাহাড়ের আড়াল থেকে দুটো দুর্বৃত্ত সবকিছুই দেখেছে এতক্ষণ। রীকি বলল আলবুর্জকে—"একেই বলে জোর বরাত। মেয়েটাকে তো পেলামই হাতে, আরও ফাউ পেলাম দুটো বন্দুক।"

"আর সোনায় সোহাগা, আমাদের এ-রাহাজানির সাক্ষী কেউ রইল না। চলে এসো, আর দেরী নয়।"—বলল আলবুর্জ। মুহূর্তের মধ্যে উৎরাই নামতে শুরু কারলো ওরা দুজনে।

এমরেল্ডা তক্ষুণি দেখতে পেল ওদের। তার প্রথমে মনে হলো, তার বন্ধুরাই ফিরে আসছে বুঝি। হর্ন আর হেক্টার। কিন্তু ভুল ভাংগতে দেরী হল্লো না। ওরা চেনা লোক তো! আর একটু নিকটে আসতেই সে ডেকে বললো—"আরে। তোমরা কোত্থেকে, আলবুর্জ-রীকি?"

স্মরণ রাখতে হবে এমরেল্ডা জানে না যে ভাল্লা থেকে পালাবার পর রাত্রেই সবুজমণি চুরি করে নিয়ে অরণ্যের ছাউনি থেকে হাওয়া দিয়েছিল আলবুর্জ–রীকি। এমরেল্ডা নিজে ছাউনি ত্যাগ করেছিল তাদের আগেই।

আলবুর্জ-রীকি তার সম্ভাষণের জবাবে হাসিমুখে বললো —"আপনি খুব বাঁচা বেঁচে গিয়েছেন রাণি! আমরা সব দেখেছি পাহাড়ের উপর থেকে। কিন্তু সাহায্য করবার কোনো উপায় তো ছিল না। বন্দুক নেই আমাদের। তা ছাড়া ছিলামও অনেক দূরে।"

"তা তোমরা এখানে করছ কী?"—জিজ্ঞাসা করল এমরেল্ডা।

"আমরা? আমরা খুঁজে খুঁজে বেড়াচ্ছি, রেললাইনটা কোথায়। কয়েক হপ্তাই ঘুরছি এই অঞ্চলে। বেমালুম হারিয়ে গিয়েছি আমরা।"

রীকি এদিকে মৃত বন্দুকবাহীর হাত থেকে বন্দুক আর কোমর থেকে কার্তুজ বুলেটগুলো অপসারণে ব্যস্ত। আর আলবুর্জ? সে এমরেল্ডার উৎকৃষ্ট রাইফেলটার দিকে তাকিয়ে আছে লোলুপ দৃষ্টিতে।

এমরেল্ডা এসব লক্ষ্য করেনি। সে আলবুর্জকে বলছে— "আমরাও তো রেললাইনেই যাব। ইচ্ছে করলে তোমরা আমাদের ছাউনিতে এসে থাকতে পারো। আমাদের সঙ্গে যেতে পারবে তাহলে।"

"তাহলে তো চমৎকারই হয়"—জবাব দিল আলবুর্জ গদগদ স্বরে।—"বাঃ, কী সুন্দর রাইফেলটি আপনার হাতে। দিন না, দেখি একটিবার—" হায়রে বোকা মেয়ে! কিছুমাত্র না ভেবে না চিন্তে সে রাইফেলটা তুলে দিল আলবুর্জের হাতে, তারপরে মৃত বন্দুকবাহীর পাশে বসে পড়ে পরীক্ষা করতে লাগল তার দেহ।

"একদম মরে গিয়েছে। বড়ই দুর্ভাগ্য। তোমাদের সঙ্গে তো লোকজন আছে নিশ্চয়ই? তাদের দিয়ে যদি দেহটা আমাদের ছাউনিতে নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা কর!"

আলবুর্জ বন্দুক হাতিয়েছে, সে আর মুখোশ পরে থাকার প্রয়োজন বুঝল না। মুচকি হেসে বলল—"আমরা তো যাচ্ছি না তোমাদের ছাউনিতে!

"ওঃ তাই না কি?"—বিষণ্ণভাবে জবাব দিল এমরেল্ডা— "তা হলে? আমি তা হলে করি কী? আমি তো আর একা ওকে বয়ে নিতে পারব না?"

"কেন ও-নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছ? ছাউনিতে ফিরে যাচ্ছ তুমিও?"

Jokes
The crisper, creamier chocolate wafer
FOR PLAY-TIME WITH PALS
Hurry!
Get your pack now
And have fun galore
With Jokes to crack
And games to play
Jokes
CHOCOLATE WAFERS
Jokes
CHOCOLATE WAFERS
Jokes CHOCOLATE WAFERS
Jokes
Free
A colourful leaflet full of exciting games/puzzles tricks and jokes with every Family and Party Pack
From the makers of TRUE biscuits

"তার মানে ?"

"তার মানে বুঝে নাও। আমি যা বলছি, ঠিক তাই। ছাউনিতে ফিরে যাচ্ছ না তুমি। যাচ্ছ তুমি আমাদের সংগে।"

"মোটেই না। কক্ষণো না।"

"শোনো এমরেল্ডা। আমরা ঝামেলা করতে চাই না তোমার সংগে। চাই না তোমায় কষ্ট দিতে। কিন্তু তোমায় সংগে নিয়ে যাওয়া আমাদের দরকার।"

"কেন দরকার ?" আলবুর্জের কথায় রীতিমত ভয় পেয়েছে এমরেল্ডা।

"আমরা একটা মণি হারিয়েছি আর একটা আছে আমাদের কাছে। যেটা আছে, সেটা আসল কি না তা বুঝতে পারছি না। মোদ্দা সেটাকে দিয়ে কোনো কাজই করতে পারছি না আমরা। এর মানে তো এই রকমই হয় যে হয় সে মণিটা আসল মণি নয়, আর নয় তো মণিকে দিয়ে কাজ করাবার এমন কোনো কলাকৌশল আছে, যা আমাদের জানা নেই। আসল মণি যদি না হয় এটা, তবে তো চুকেই গেল, আমাদের এখন চেষ্টা করতে হবে আসল মণিটা ফিরে পাওয়ার। কিন্তু এমন যদি হয় যে মণিটা আসলে সবুজ মণিই বটে, ওকে দিয়ে কাজ করানো যাচ্ছে না শুধু আমাদের অজ্ঞতার দরুন,তাহলে তো আমাদের একান্ত দরকার তোমাকেই। তুমি তো ওর নাড়ী নক্ষত্র জানো। আমরা যা চাইব মণির কাছে তা তুমি আদায় করে দিতে পারবে। বুঝলে এইবার ? আমাদের খুব আশা যে তোমাকে হাতে পেলেই সবুজ মণির দৌলতে আমরা রাজা-বাদশা বনে যেতে পারব। তুমিও ফাঁকি পড়বে না। অনায়াসে রাণী হতে পারবে। আমি বিয়ে করব তোমায়।"

দাঁত বার করে একটু হেসে নিল আলবুর্জ।

রীকি এতক্ষণ চুপচাপ ছিল, আর থাকতে পারল না। খেঁকিয়ে উঠল—"মাইরি আর কি ! বিয়ে করবে ? তুমি ? আর আমি ভেসে যাব ? ওর উপরে দাবি তোমারও যতটুকু, আমারও ততটুকু।"

"তোমাদের কারোই কোনো দাবি নেই আমার উপরে" – বলল এমরেল্ডা। মুখে যতই জোর দেখাবার চেষ্টা করুক, মনে মনে যে তার দারুণ ভয় হয়েছে, তা তো ক্ষীণ কণ্ঠের কাঁপা কাঁপা কথাতেই প্রকাশ—"তোমরা দুটি আস্ত বোকা। আমায় যদি তোমরা ধরে নিয়ে যাও, তোমাদের পিছনে লোক ছুটবে। যে-লোকের হাতে নিস্তার নেই তোমাদের। বুদ্ধি বলে যদি কোনো জিনিস থাকে তোমাদের, আমাকে এক্ষুণি ছেড়ে দেবে তোমরা। সবুজ মণি দিয়ে যাদুর খেল দেখানোর আশা ছেড়ে দাও। সাধারণ মণি হিসেবেই ইউরোপের বাজারে ওর দাম হবে কয়েক মিলিয়ন পাউন্ড। তাই নিয়ে বড়মানুষী কর গিয়ে।"

"হুঁঃ, সোজা কথা কিনা, ইউরোপের বাজারে অমন একটি

ছাউনিতে ফিরে যাচ্ছ না তুমিও

মণি বিক্রি করে দেওয়া! না না, ওসব কথায় চিঁড়ে ভিজবে না। চল তুমি আমাদের সঙ্গে।"

দুই দিকে দুজন ধরে ফেললো এমরেল্‌ডার হাত। দুজনেরই হাতে রাইফেল। আর তা না থাকলেই বা হতো কি। অবারিত আকাশে শুধু শকুন উড়ছে কয়েকটা, তাদের লক্ষ্য বন্দুকবাহীর আর নিহত সিংহের লাশ দু'টো। আর কোথাও জীবিত প্রাণীর কোনো চিহ্ন নাই অরণ্যে পর্বতে।

ওদিকে ন্যাথানিয়েল হর্নও মেরেছে একটা সিংহ, পরপর দুটো গুলি করে। তার কয়েক মিনিট পরেই সে এদিক থেকেও শুনতে পেলো রাইফেলের আওয়াজ। এক দুই তিন। হেক্টর কোনো জানোয়ারেরই দেখা পায়নি। হর্নের গুলির আওয়াজ পেয়ে তারই সঙ্গে মিলিত হলো গিয়ে, দুজনে পরামর্শ করল, সঙ্গের লোকেদের দিয়ে নিহত পশুটা ছাউনিতে পাঠিয়ে দিয়ে তারা দুজনে এগিয়ে যাবে এমরেল্‌ডার দিকে।

গুলির শব্দ যেদিক থেকে শোনা গিয়েছিল, ওরা এগুতে লাগল সেই দিকে। কিন্তু কোথায় এমরেল্‌ডা? দুই ঘন্টা খোঁজা-খুঁজি করে, নাম ধরে চ্যাঁচামেচি করে, কোনোমতেই তারা সন্ধান পেলো না তার। অবশেষে, যখন তারা প্রায় হতাশই হয়ে পড়েছে, তখন একান্তই দৈবাৎ, হঠাৎ তারা দেখতে পেলো, এক জায়গায় দুই দুটো মৃতদেহ। একটা মানুষের, একটা সিংহের। মৃত বন্দুকবাহীর উপরে মৃত সিংহ।

কিন্তু এমরেল্‌ডা কই?

মাটি ওখানে শক্ত পাথুরে। কোনো পায়ের চিহ্ন তাতে পড়েনি। তা যদি পড়ত, অশিক্ষিত চোখেও ওরা অবশ্যই দেখতে পেত যে এমরেল্‌ডা এবং বন্দুকবাহী ছাড়াও অন্য দুই একজন লোকের আগমন হয়ে ছিল। কাজেই হর্ন আর হেক্টর স্বভাবতঃই এই সিদ্ধান্তে পৌছল যে সিংহের মাথাটা কেটে নেবার বা বন্দুকবাহীর দেহটা ছাউনিতে বহন করে নিয়ে যাওয়ার মতো লোক হাতের মাথায় না পাওয়ায় এমরেল্‌ডা বাধ্য হয়ে নিজেই ছাউনিতে ফিরে গিয়েছে লোক নিয়ে আসবার জন্য। কাজেই নিজেরাও চটপট সেই ছাউনিতেই পৌছনো ছাড়া তাদের করার কিছু নেই।

এমরেল্‌ডা হারিয়ে গিয়েছে বা অপহৃতা হয়েছে, এমন ধারণা তাদের হয়নি। নিজেরা ছাউনিতে পৌছনোর আগে পর্যন্ত। কিন্তু পৌছোনোর পরে? ওদের মাথায় একেবারে যেন আকাশ ভেঙে পড়ল। ছাউনিতে আসেনি তো এমরেল্‌ডা! নিশ্চয় তার বিপদ ঘটেছে কিছু।

এদিকে বেলাও গড়িয়ে গিয়েছে। খোঁজাখুঁজিতে বেরুতে হলে কালবিলম্ব করা চলে না। সাফারির যাবতীয় লোককে ওরা ভাগ করে ফেলল তিন দলে। একদল ছাউনিতেই রইল এক দেশী সর্দারের অধীনে। তারা মস্ত একটা আগুন জ্বালিয়ে রাখবে সারারাত। যদিই এমনটা হয় যে এমরেল্‌ডা পথ ভুলে গিয়েছে, তাহলে আগুনের ছটা আকাশে দেখে সে ছাউনির অবস্থান আন্দাজ করে নেবে। সর্দারের উপরে আর নির্দেশ রইল যে মাঝে মাঝে সে রাইফেল দিয়ে গুলি চালাবে, এমরেল্‌ডার দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য।

অন্য দুইদল বেরুবে অনুসন্ধানে। সিংহ আর বন্দুকবাহী মারা গিয়েছে যেখানে, সেই জায়গাটি লক্ষ্য করেই যাবে তারা, তবে কোনো দলই সোজা পথে যাবে না, কারণ সোজা পথ ধরেই তো হর্ন-হেক্টর একটু আগেই এলো। এবার ওদের একদল যাবে একটু ডাইনে ঘুরে, অন্য দল একটু বাঁয়ে ঘুরে।

সারা রাত্রি নিষ্ফল অন্বেষণ কাটিয়ে, পরদিন দুপুর নাগাদ শ্রান্ত দেহে টলতে টলতে হর্ন আর হেক্টর অগত্যা ফিরে এল ছাউনিতে।

হর্ন বলল,"আমরা অনর্থক হয়রান হচ্ছি ভাই। সে যদি বেঁচে থাকত তাহলে সারা রাত্রি এই যে ছাউনি থেকে রাইফেল ফায়ার হচ্ছে, সে কি আর তা শুনত না?"

হেক্টর মাথা নাড়ল—"একটা কথা আমরা মোটে খেয়াল করিনি। রাইফেল ছিল এমরেল্‌ডার হাতে, ছিল বন্দুকবাহীরও। সে দু'টো গেল কোথায়? রাইফেলের তো পা নেই! নিশ্চয়ই কেউ নিয়ে গিয়েছে। অর্থাৎ অন্য মানুষও এসেছিল ওখানে। অন্য মানুষ এসেছিল, এবং তারপর থেকেই এমরেল্‌ডা নিপাত্তা, এর মানে কি এই হতে পারে না যে সেই মানুষেরাই ধরে নিয়ে গিয়েছে ওকে?"

হর্ন যেন চমক খেল একটা—"আমরা তো নেহাতই গাড়োল হে, এমন একটা মোটা কথা আমাদের মাথায় আসতে পুরো একদিন কেটে গেল! খুব সম্ভব, সেই ব্যাপারই ঘটেছে। অপহৃতাই হয়েছে এমরেল্‌ডা। কিন্তু আমরা এখন করতে পারি কী? টারজান উপস্থিত থাকলে এক্ষুণি বলে দিত, কোন দিকে গিয়েছে ডাকাতেরা এমরেল্‌ডাকে নিয়ে, অনুসরণও করত তাদের। কিন্তু হাওয়ায় গন্ধ শুঁকে মানুষের গতিপথ নিরূপণ করা বা গাছের মাথায় মাথায় তার অনুসরণ করার সাধ্য তো আমার বা তোমার নেই। এ অবস্থায়—"

হেক্টর বললে—"এ অবস্থায় এমরেল্‌ডাকে উদ্ধার করতে হলে আমাদের উচিত হবে সেই টারজানেরই আবারও শরণ নেওয়া।"

অনেক যুক্তি-পরামর্শের পরে সেইটিই ওরা করল। বিশদ ভাবে সমস্ত বিবরণ দিয়ে একটা চিঠি টারজানের কাছে লিখল ওরা দুজনে, দুজন রাইফেলধারী লোক সাফারি থেকে বেছে নিয়ে তাদের পাঠিয়ে দিল টারজানের কাছে।

বাকী লোকদের দুই দলে ভাগ করা হলো আবার। হর্ন একদল নিয়ে চলে গেল রেললাইনের দিকে। তার দেশে না ফিরলেই নয়। অন্য দলটি সঙ্গে নিয়ে হেক্টর বেরুলো এমরেল্‌ডার সন্ধানে। টারজান কত দিনে আসতে পারবে, তার ঠিক কী? যতদিন না আসে, হেক্টরই যথাসাধ্য চেষ্টা করুক।

[চলবে]

ছবি: নারায়ণ দেবনাথ

শুধু খেলা আর খেলা

শান্তিপ্রিয় বন্দ্যোপাধ্যায়

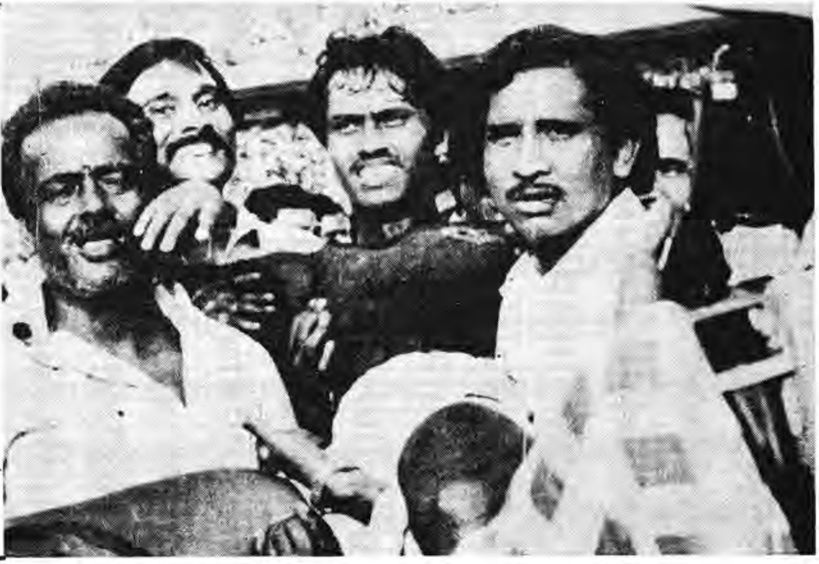

বিল্টু, মন্টুরা এবার আনন্দে লাফাচ্ছে। এতো খুশি ওরা অনেকদিন হয়নি। নল্টে-ভল্টেদের মুখ চুন। ওদের গলিতে আবার ফুটবল খেলা জমে উঠেছে। বিল্টু-মন্টুরা মোহনবাগান। সব খেলাতেই ওদের জিততে হবে। তবে ট্রাই ব্রেকারে নয়—এমনিই জিতবে ওরা। ওরা হিসেব করছে—ফেডারেশন কাপ, সিকিমের গভর্নর্স গোল্ড কাপ আর দিল্লির ডুরান্ড কাপ মোহনবাগান ইতিমধ্যেই জিতেছে। বাকী আছে বোম্বাইয়ের রোভার্স কাপ আর কলকাতার আই. এফ. এ শীল্ডের খেলা। তা এই খেলা ছাপা হতে হতে তাও বোধহয় হয়ে যাবে। কে জিতবে। তাই নিয়ে বিল্টু-মন্টুদের গবেষণা শুরু হয়ে গেছে মোহনবাগান ডুরান্ড কাপ জেতার দিন থেকেই।

এবার ডুরান্ড কাপ জিতে মোহনবাগান ইতিহাস সৃষ্টি করেছে। তারা দুবার ডুরান্ড কাপ জিতলো পরপর তিন বছর করে। ষাটের দশকে মোহনবাগান ডুরান্ড কাপ জিতেছিলো টানা তিন বছর। এবার আবার তাই হলো। ১৯৮৪, ৮৫ আর ৮৬ সালে জিতে আবার হ্যাটট্রিক করলো মোহনবাগান। ডুরান্ড জেতার ডবল হ্যাটট্রিক এক স্মরণীয় নজির। এমন ঘটনা আর কখনও ঘটেনি। কখনো ঘটবে কিনাও সন্দেহ।

এবারের ডুরান্ড কাপের ফাইনালে মোহনবাগানের খেলা ছিলো চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী ইস্টবেঙ্গলের সঙ্গে। খেলা শেষ হবার মাত্র পাঁচ মিনিট আগে মোহনবাগান খেলার একমাত্র গোলটি করে। বাবু মানি ডান প্রান্ত দিয়ে এগিয়ে এসে তরুণ দে-কে কাটিয়ে উঁচু করে সেন্টার করেন। শিশির ঘোষ হেড দিয়ে বলটি বাড়িয়ে দেন দেবাশিস রায়ের কাছে। দেবাশিস চকিতে শুয়ে পড়ে বলটি ঠেলে দেন গোলে। ইস্টবেঙ্গলের গোলরক্ষক অতনু ভট্টাচার্য কিছু বোঝার আগেই বলটি জড়িয়ে যায় ইস্টবেঙ্গলের জালে।

ঐ গোলটিই মোহনবাগানকে এনে দিলো ঐতিহাসিক জয়। ডুরান্ড কাপে ডবল হ্যাটট্রিক করার অনন্য সম্মান। মোহনবাগান এর আগে ডুরান্ড কাপ জিতেছে ১৪ বার। ফাইনালে উঠেছে কুড়ি বার।

মোহনবাগান চ্যাম্পিয়ন হয়েছে—১৯৫৩, ৫৯, ৬০ (যুগ্ম-ভাবে) ৬৩, ৬৪, ৬৫, ৭৪, ৭৭, ৭৯, ৮০, ৮২ (যুগ্মভাবে), ৮৪, ৮৫ ও ৮৬ সালে। রানার্স আপ হয়েছে— ১৯৫০, ৬১, ৭০, ৭২, ৭৮ ও ৮৩ সালে।

এবার নিয়ে ডুরান্ড ফাইনালে মোহনবাগান-ইস্টবেঙ্গলের খেলা হলো আটবার। দু দলই জিতেছে তিনবার করে। মোহনবাগান জিতেছে—১৯৬৪ সালে ২–০ গোলে, ১৯৮৪ সালে ১–০ গোলে আর এবার ১–০ গোলে।

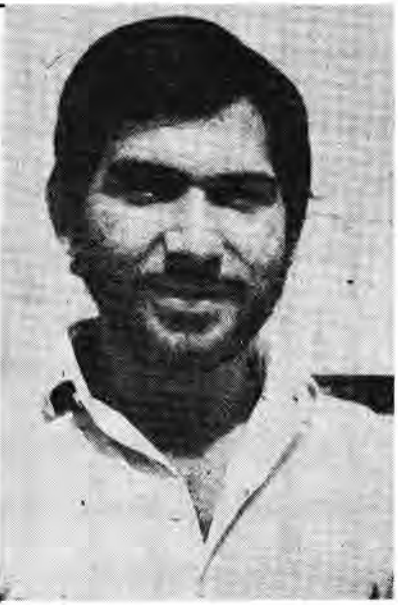

অরুণলাল

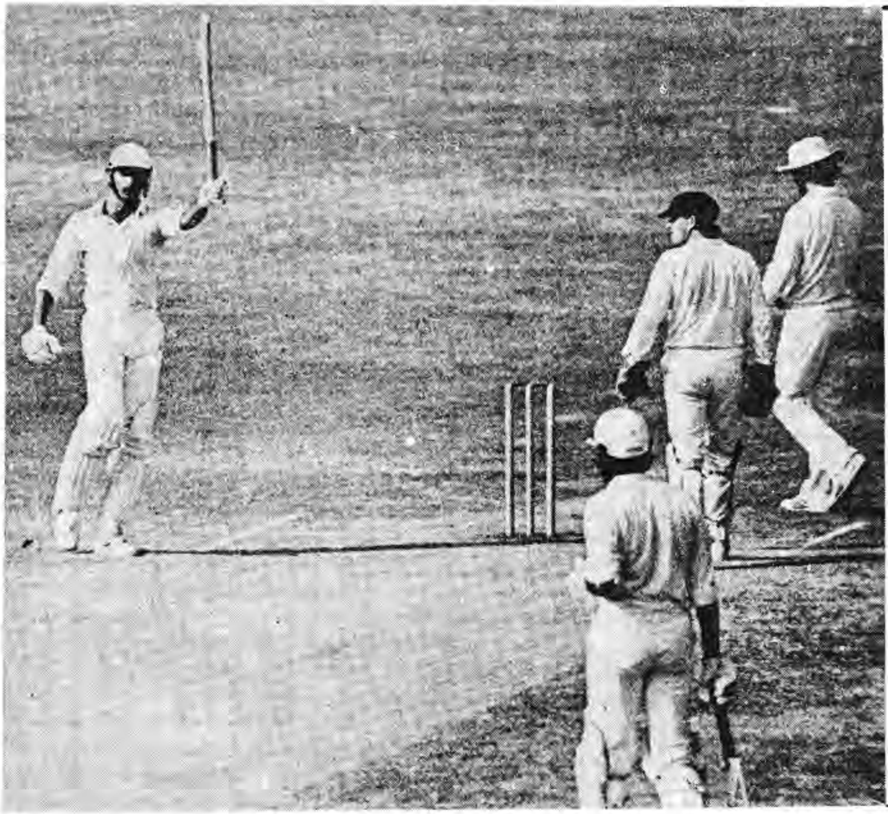

বোম্বাইয়ে সেঞ্চুরির পর
রবি শাস্ত্রী

ইস্টবেঙ্গল জিতেছে তিনবার–১৯৭০ সালে ২–0 গোলে, ১৯৭২ সালে 0–0 ও ১–0 গোলে, ১৯৭৮ সালে ৩– 0 গোলে।

বাকি দুবার ড্র হয়। এবং যুগ্ম বিজয়ী হয় দু দল। ১৯৬0 সালে ১–১ ও 0–0 এবং ১৯৮২ সালে 0–0। মোহনবাগান পর পর তিনবার ডুরান্ড কাপ জিতলো দুবার। ৬৩, ৬৪ ও ৬৫ সালে প্রথম তারা পর পর তিনবার চ্যাম্পিয়ান হয়েছিলো। সেবার তারা হারিয়েছিলো যথাক্রমে অন্ধ্র পুলিশকে (0–0; ২–0), ইস্টবেঙ্গলকে (২–0) এবং পাঞ্জাব পুলিশকে ২–0 গোলে। সেবার অর্থাৎ ১৯৬৩ ও ৬৪ সালে চুনী গোস্বামী ছিলেন মোহনবাগানের অধিনায়ক আর ১৯৬৫ সালে জার্নাল সিং।

১৯৮৪, ৮৫ ও ৮৬ সালের ফাইনালে মোহনবাগান হারিয়েছে যথাক্রমে ইস্টবেঙ্গলকে ১–0, জে.সি.টি কে 0–0 ও ৩–২ (টাই ব্রেকার) ও ইস্টবেঙ্গলকে ১–0 গোলে। তিনবছরের দলনেতা শ্যামল ব্যানার্জি, বিদেশ বসু ও কৃষ্ণেন্দু রায়।

মোহনবাগান ক্লাবের শতবর্ষ আসছে। মস্ত উৎসব হবে। বিদেশ থেকে ফুটবল, ক্রিকেট, হকি দল আসবে। এমন কি মারাদোনাকে পর্যন্ত আনার চেষ্টা চলছে। পেলেকেও কলকাতায় এনেছিলো মোহনবাগান। এবার যদি মারাদোনাকে আনতে পারে তাহলে আর কিছু বলার থাকবে না।

এদিকে দলবদলের সময় এগিয়ে আসছে। মোহনবাগান দারুণ শক্তিশালী দল গড়তে চাইছে। আসছে বছর কলকাতার অনেক নামকরা খেলোয়াড়কেই হয়তো সবুজ মেরুন জার্সি পরতে দেখা যাবে।

আরও বড় খবর কলকাতায় এবার জাতীয় ফুটবল প্রতিযোগিতা হবে। জাতীয় ফুটবল প্রতিযোগিতায় গত ক'বছর বাংলা তেমন খেলতে পারছে না। এবার কলকাতায় খেলা–তাই মনে হয় বাংলা তাক লাগিয়ে দেবে। দারুণ খেলে চ্যাম্পিয়ন হবে।

আসছে বছর তো শুধু খেলা আর খেলা। ফেব্রুয়ারী মাসে কলকাতায় পাকিস্তানের সঙ্গে ভারতের টেস্ট ম্যাচ। টেস্টের পর একদিন বাদ দিয়ে একদিনের আন্তর্জাতিক ম্যাচটি খেলবে ভারত আর পাকিস্তান। আর তারপর ক'মাস কাটতেই শুরু হয়ে যাবে বিশ্বকাপ ক্রিকেট প্রতিযোগিতা। এই প্রতিযোগিতা হবে আসছে বছর অক্টোবর-নভেম্বর মাসে। কলকাতার ইডেন উদ্যানে ফাইনাল খেলা হবে–নভেম্বর মাসের ৮ তারিখে। দরকার হলে খেলাটি তিন দিন পর্যন্ত চলবে। ফাইনাল ছাড়াও কলকাতায় আর একটি ম্যাচ হবে।

লয়েড, দুঁজো ও রিচার্ডস

রিচার্ডসের মতে

বর্তমান বিশ্বের শ্রেষ্ঠ ব্যাটসম্যান বলতে সবার আগে ভিভিয়ান রিচার্ডসের নামটাই মনে আসবে। রিচার্ডস তাঁর দল নিয়ে পাকিস্তানে খেলা শুরু করার আগে ভারতে একটি বেনিফিট ম্যাচ খেলে গেছেন। বোম্বাইয়ে সেই খেলার সময় তাঁর কাছে কিছু প্রশ্ন লিখে পাঠিয়েছিলাম। রিচার্ডস তাঁর উত্তর দিয়েছেন। সেই সঙ্গে জানিয়েছেন আরও অনেক ব্যক্তিগত কথা।

জানতে চেয়েছিলাম যাঁদের সঙ্গে বা বিরুদ্ধে খেলেছেন তাঁদের মধ্যে কার কার খেলা আপনার ভালো লেগেছে বা আপনাকে অভিভূত করেছে?

ভিভ জানিয়েছেন, সবার নাম করতে গেলে সে তালিকা মস্ত বড় হয়ে যাবে। তাই খেলোয়াড় এবং মানুষ হিসেবে যাঁরা আমার জীবনে প্রভাব ফেলেছেন তেমনই কয়েক জনের কথা বলছি। অস্ট্রেলিয়ার ডেনিস লিলি আর ইয়ান ও গ্রেগ চ্যাপেল দুরন্ত প্রতিপক্ষ। ভারতের সুনীল গাভাসকার দুর্দান্ত ব্যাটসম্যান। আর আমাদের জোয়েল গারনার খেলোয়াড় হিসেবে যেমন দুর্ধর্ষ তেমনি মানুষ হিসেবেও দারুণ। আর ক্লাইভ লয়েড? আমার জীবনে ওঁর প্রভাবই তো সব থেকে বেশি।

দ্বিতীয় প্রশ্ন ছিল, আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে ভিভের চোখে নবাগত খেলোয়াড়দের স্থান এবং মূল্যায়ন প্রসঙ্গে।

উত্তরে ভিভ লিখেছেন, প্রথমেই আমি আমার দেশের একজন খেলোয়াড়ের কথা বলতে চাই। ওয়েস্ট ইন্ডিজের রিচি রিচার্ডসনের নাম আপনারা নিশ্চয়ই শুনেছেন। ওকে আমি ছোট্ট থেকেই চিনি। আমার নিজের দ্বীপের ছেলে তো! আমার বিশ্বাস ও নির্ঘাৎ বড় খেলোয়াড় হবে। এরই মধ্যে তো কয়েকটি সেঞ্চুরি করে ফেলেছে। ও ভালো খেললেই আমার আনন্দ হয়।

আমি অবশ্য জানি, তোমরা বিশেষ ভাবে কার কথা শুনতে চাইছ। তোমাদের তরুণ প্রতিভা মহম্মদ আজহারউদ্দিনের কথা তো! আজহারকে আমি অস্ট্রেলিয়ায় বেনসন-হেজেস ওয়ার্ল্ড চ্যাম্পিয়ানশিপের খেলায় দেখেছিলাম। শারজাতেও দেখেছি। তবে ঐ তিনটি সেঞ্চুরির একটিও করতে দেখিনি। আমার মনে হয় ওর সময়টা এখন নেহাতই খারাপ যাচ্ছে। তবে ওর দারুণ সম্ভাবনা আছে। একটু চেষ্টা আর পরিশ্রম করলেই আজহারউদ্দিন আবার শিরোনামে এসে যাবে। আসলে ও ছাই চাপা আগুন। ছাই কি আর চাপা থাকে?

আপনার অন্তরঙ্গ বন্ধু ইয়ান বথাম সম্বন্ধে আপনার কাছ থেকে কিছু শুনতে চাই।

দেখুন বথাম আমার ভীষণ বন্ধু। আমরা দুজনে এক সঙ্গে বড় হয়েছি। খেলেছি। বছরের পর বছর এক সঙ্গে থেকেছি। বথামের মতো বিশ্বাসী আর আন্তরিক মানুষ আমি আর দেখিনি। ও মানুষকে ভালোবাসে। ছোটদের জন্যে জীবন দিতে পারে। দেখছেন না ছোটদের লিউকোমিয়া রোগের বিরুদ্ধে ও একা কেমন লড়ছে। মাইলের পর মাইল হাঁটছে টাকা তুলতে। কতো বড় লিউকোমিয়া রিসার্চ সেন্টার তৈরি করছে, ক্লিনিক করছে। কিন্তু ওকে কেউ বোঝে না। এক সময় ওকে মাথায় তোলা হয়েছিলো এখন টেনে নামানোর চেষ্টা চলছে। তাতে অবশ্য কিছু আসে যায় না। ভগবান আছেন। ওর পাশে কেউ না থাকলেও ও ভেঙে পড়ার মতো মানুষ নয়। ভগবানই ওকে আগলে রাখবেন। দেখবেন। কেউ কোনোদিন

আজহারউদ্দিন

অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে ৩৩ তম সেঞ্চুরির পর গাভাসকার

ওর তেমন কোনো ক্ষতি করতে পারবে না।

পরের প্রশ্ন ছিল, লয়েডের জায়গায় আপনি এখন ক্যারিবিয়ান দলপতি। এই পদে কেমন লাগছে?

দেখুন ওয়েস্ট ইন্ডিজ দলে খেলাটাই মস্ত গৌরবের বিষয়। সেই দলের ক্যাপ্টেন আমি। বুঝতেই পারছেন আমার মনের অবস্থা। খেলার প্রতিটি মুহূর্ত আমি উপভোগ করছি। খেলায় হার-জিৎ আছেই। খেলাকে আমরা খেলা হিসেবেই নিই। যদিও আজকাল খেলাই আমাদের পেশা। আমার সঙ্গে আছে এমন একদল খেলোয়াড় যারা সাফল্যের জন্যে প্রতি মুহূর্তে মুখিয়ে থাকে। আগে ওয়েস্ট ইন্ডিজ দলটাই ছিলো কয়েকজন খেলোয়াড়ের ব্যক্তিগত সাফল্যের ওপর নির্ভরশীল। এখন তো আর তা নয়। এখন প্রতিটি ক্যারিবিয়ান ক্রিকেটার ব্যাটে বলে সফল হতে চায়। তাই আমি খুশি। তার চেয়েও বেশি খুশি আমি ক্লাইভ লয়েডের জয়ের ধারাটা অব্যাহত রাখতে পেরেছি বলে!

আপনি এখন নিচের দিকে ব্যাট করেন। সুনীল গাভাসকারও চান পরে ব্যাট করতে আসতে। কেন? এতে সুবিধেটা কি?

সুবিধে অনেক। আমার কথাই ধরুন—আমি দলের সিনিয়ার খেলোয়াড়। পরে ব্যাট করতে নামলে আমি খানিকটা 'রিল্যাক্স' করতে পারি। আমি আছি—এই সত্যটা তরুণ খেলোয়াড়দের ওপর চাপ অনেক কমিয়ে দেয়। ওরা ফ্রিলি খেলতে পারে। তাড়াতাড়ি রান তোলার দরকার হলে পরে নেমে আমি তা সহজেই করতে পারে। তা ছাড়া আমি তো যে কোন সময়ই ওপরের দিকে ব্যাট করতে আসতে পারি। সুনীল গাভাসকারও বোধহয় এই জন্যেই পরে ব্যাট করতে নামতে চেয়েছিলো। এই ব্যাপারে আমি সুনীলের সঙ্গে একমত। একটা কথা মনে রাখার দরকার যে সিনিয়ার একজন খেলোয়াড় পরে ব্যাট করার জন্যে তৈরি থাকলে চটপট ক'টা উইকেট হারালেও তার চাপ অনেকটাই কমে যায়।

আপনি একবার রেগে গিয়ে গ্যালারিতে উঠে গিয়েছিলেন একজন দর্শককে মারবেন বলে। কেন গিয়েছিলেন? আপনার মতো একজন খেলোয়াড়ের পক্ষে কি তা সংগত হয়েছিলো?

দেখুন অন্য কেউ প্রশ্নটা করলে আমি হয়তো উত্তর দিতাম না। কিন্তু আপনারা এবং আমরা একই—আমরা ব্ল্যাক, আপনারাও তাই। তা ছাড়া ভারত চিরকাল ব্ল্যাকদের জন্যে লড়ছে। একটা কথা আমি জোর গলায় বলতে চাই—আমি কালো বলে গর্বিত। আমার গায়ের রং আমার গর্ব। সেদিন আমার গায়ের রং তুলে আমার পরিবারবর্গকে টেনে এনে আমায় গালাগাল দেওয়া হলো। কোন মাঠে আমায় গালাগাল দেওয়া হলো—যে মাঠকে আমি আমার নিজের মাঠ বলে ভাবি, যে মাঠে আমি বছরের পর বছর ধরে খেলছি। তাই ঐ গালাগাল শুনে সেদিন আর আমি নিজেকে সামলাতে পারি নি। লাফিয়ে উঠে গ্যালারিতে চলে গিয়েছিলেম লোকটাকে খুঁজতে। পাই নি। পেলে হয়তো মেরেই দিতাম।

দিলীপ বেংসরকার

ক্রিকেটের লর্ড ক্লাইভ

(আঠারো)

ক্রিং...ক্রিং...ক্রিং...ক্রিং...
লিডসের প্যাভিলিয়নে টেলিফোন বেজে উঠলো। মাঠে তখন জমাটি খেলা। ইয়র্কশায়ারের সঙ্গে ল্যাঙ্কাশায়ারের। ক্লাইভ লয়েড তখন ল্যাঙ্কাশায়ার দলের খেলোয়াড়। একটু পরেই ব্যাট করতে যাবেন। সেজেগুজে বসে আছেন।

টেলিফোনটা বেজেই চলেছে। একজন গিয়ে তুললেন,

হ্যালো....

আমি ডেলি মিররের ক্রিকেট করসপনডেন্ট হাওয়ার্ড বুথ বলছি। ক্লাইভ লয়েডের সঙ্গে কথা বলতে চাই। জরুরি....

একটু ধরুন।

টেলিফোনটা রেখে ভদ্রলোক গিয়ে ক্লাইভকে ডাকলেন, তোমার ফোন—ডেলি মিররের হাওয়ার্ড বুথ কথা বলতে চাইছেন।

বুথ.... লাফিয়ে উঠলেন ক্লাইভ। বুথ ওঁর বন্ধু। ইংলন্ডের ক্রিকেট লেখকদের মধ্যে বুথের সঙ্গেই ওঁর সব থেকে ভাব। বুথ জানে আজ ওঁর খেলা। তবু যখন ফোন করছে তখন নিশ্চয়ই কোনো জরুরি খবর আছে। ক্লাইভ তাড়াতাড়ি গিয়ে ফোন ধরলেন,

হ্যালো....ক্লাইভ বলছি....

কনগ্রাচুলেশনস্ ক্লাইভ....

কিন্তু কেন? কি হলো....।

সে কি? তুমি জানো না?

কি বলো তো?

আরে তুমি ওয়েস্ট ইন্ডিজের ক্যাপ্টেন হয়েছো....

যাঃ.... বাজে রসিকতা কোর না!

বিশ্বাস হচ্ছে না? ঠিক আছে আজ সন্ধ্যের কাগজ দেখো....

ফোন ছেড়ে দিলেন বুথ! আর ক্লাইভ! প্রথমে হতভম্ব হয়ে খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলেন। অনেক দিন ধরেই খবরটা ছড়াচ্ছিলো। রোহান কানহাইয়ের পর তিনিই ওয়েস্ট ইন্ডিজের অধিনায়ক হবেন। তিনি অবশ্য তেমন গুরুত্ব দেননি খবরটার। রোহান দুর্দান্ত খেলেন। বয়েস হলেও খেলার ধার মোটেই কমেনি। গ্যারি সোবার্সের হাতে পড়ে ক্যারিবিয়ান ক্রিকেটের যা অবস্থা হয়েছিলো সেখান থেকে তাকে ধীরে ধীরে টেনে তুলছেন কানহাই। সোবার্স ছিলেন বেপরোয়া, অসংযত। রোহান ঠিক উল্টো। সতর্ক, সংযত। হিসেব করে

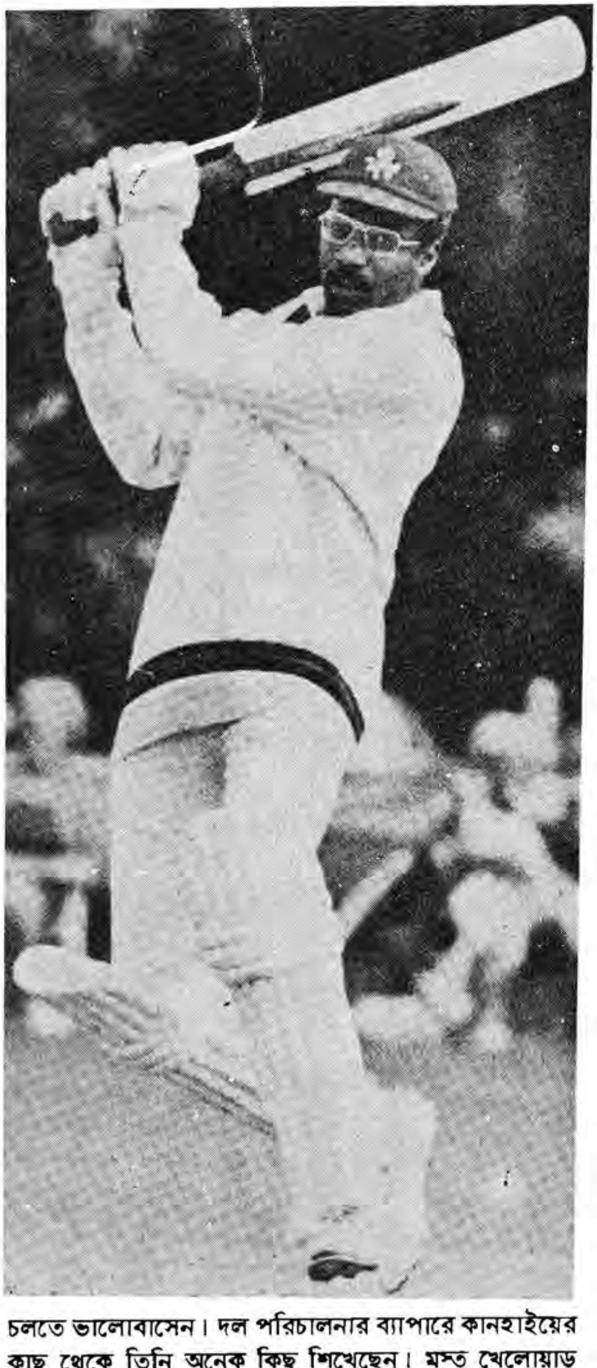

চলতে ভালোবাসেন। দল পরিচালনার ব্যাপারে কানহাইয়ের কাছ থেকে তিনি অনেক কিছু শিখেছেন। মস্ত খেলোয়াড় রোহান। একদিনের বিশ্বকাপ ক্রিকেটে ওয়েস্ট ইন্ডিজকে যেভাবে জিতিয়েছেন তার তুলনা নেই। ক্লাইভ সব সময়ই তাঁর পাশে ছিলেন। দেখেছেন সব কিছুই। সেই রোহান কানহাইয়ের জায়গায় তিনিই এখন ওয়েস্ট ইন্ডিজ দলের অধিনায়ক! কথাটা বিশ্বাস করতে ইচ্ছে করছে না। মনের মধ্যে সন্দেহের দোলা। কিন্তু আর যাই হোক, বুথ কখনো

মিথ্যে কথা বলবে না। বুথের সঙ্গে তাঁর অন্যরকম সম্পর্ক।

ক্লাইভ ফিরে এসে চেয়ারে বসলেন। লিডসের মাঠে তখন খেলা চলছে। সেইদিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে তাঁর মন চলে গেলো আর এক জগতে। কোনোদিন ভাবতেও পারেননি যে তাঁকে ওয়েস্ট ইন্ডিজের ক্যাপ্টেন করা হবে। যে ভারতে তিনি গিয়েছিলেন তাঁর জীবনের প্রথম সফরে, প্রথম টেস্ট ম্যাচ খেলতে—সেই ভারতেই এবার তাঁকে যেতে হবে অধিনায়কের বেশে। চোখের সামনে ভেসে ওঠে ভারতের মাঠগুলো। বোম্বাই, মাদ্রাজ, দিল্লি, বাঙ্গালোর আর কলকাতা। কলকাতার ইডেন উদ্যানই তাঁকে সব থেকে অভিভূত করেছিল। খেলা দেখতে অতো লোক মাঠে আসতে পারে তা তাঁর ধারণাও ছিলো না। লক্ষ লোকের সমবেত চিৎকার কিংবা উল্লাসধ্বনি এখনও যেন কান পাতলে শুনতে পান। সত্যি ইডেনে খেলাটাই থ্রিলিং ব্যাপার। লয়েড যখন কলকাতায় খেলেছিলেন তখন গ্যারি ছিলেন ক্যাপ্টেন। গ্যারির পর কানহাই। কানহাইয়ের ক্যাপ্টেন হওয়া অনেকটা সাময়িক ব্যাপার। যোগ্য কারো হাতে ওয়েস্ট ইন্ডিজের ভার তুলে দেবার আগে ব্যবস্থা। কানহাইও অধিনায়ক হিসেবে তেমন কোনো কৃতিত্বের পরিচয় দিতে পারেননি। তিনি যেন একটু বেশি সতর্ক। তা ছাড়া একটা ব্যাপারে তিনি খুবই বদনাম

কিনেছেন। ইংলন্ডের সঙ্গে টেস্ট খেলার সময় একটা সিদ্ধান্ত নিয়ে অসন্তোষ দেখা দেওয়ায় কানহাই আম্পায়ারকে পা দেখিয়েছিলেন। সেদিনের খেলা তখন শেষ হয়ে গিয়েছিলো। আম্পায়াররা ফিরে যাচ্ছিলেন প্যাভিলিয়নে। তখনই ঘটে ঘটনাটা। সেই আম্পায়ার তো রেগে আগুন। তিনি সাফ বলে দিলেন, কানহাই ক্ষমা না চাইলে তিনি আর ঐ টেস্ট ম্যাচ খেলাবেন না। তাই নিয়ে হৈচৈ ব্যাপার। শেষ পর্যন্ত পর দিন সকালে কানহাই নিজে গিয়ে আম্পায়ারের কাছে ক্ষমা চাইলেন—তখন ব্যাপারটা মিটলো।

লয়েড বুঝলেন, এ হলে কিছুতেই চলবে না। তাকে সোবার্স ও কানহাইয়ের ভালোটাই নিতে হবে। দু'জনকে মিলিয়ে মিশিয়ে তিনি এক নতুন দলনেতা হবেন। স্যার ফ্রাঙ্ক ওরেলের মতো হবেন উদার, সোবার্সের মতো পারবেন চ্যালেঞ্জ নিতে এবং দিতে আর তারই পাশাপাশি কানহাইয়ের মতো হবেন অত্যন্ত সতর্ক ও সংযত। আর নিজে সব সময় ভদ্র, বিনয়ী এবং কর্তব্যে অটল, জেতার জন্যে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। ক্যারিবিয়ান ক্রিকেটে নতুন প্রাণের জোয়ার আনবেন তিনি। ক্লাইভ লয়েড হবেন দুরন্ত দলপতি।

[চলবে]

প্রকাশিত হয়েছে

কর্মশিক্ষা আর বিজ্ঞান প্রদর্শনীর মডেল তৈরীর একমাত্র বই গঙ্গেশ ঘোষ ও মদন মুখোপাধ্যায়ের

হাতে কলমে

(১ম)

দাম মাত্র নয় টাকা।

সহজ সরল ভাষায় লেখা চোখ-ধাঁধানো মন-মাতানো দশ-দশটা মডেল বোঝানো আছে অসংখ্য ছবিতে। প্রত্যেক পাতায় মজা। শুধু তৈরীই নয় পড়েও সমান মজা।

নিউ বেঙ্গল প্রেস
৬৮, কলেজ স্ট্রীট : কলকাতা-৭০০০৭৩

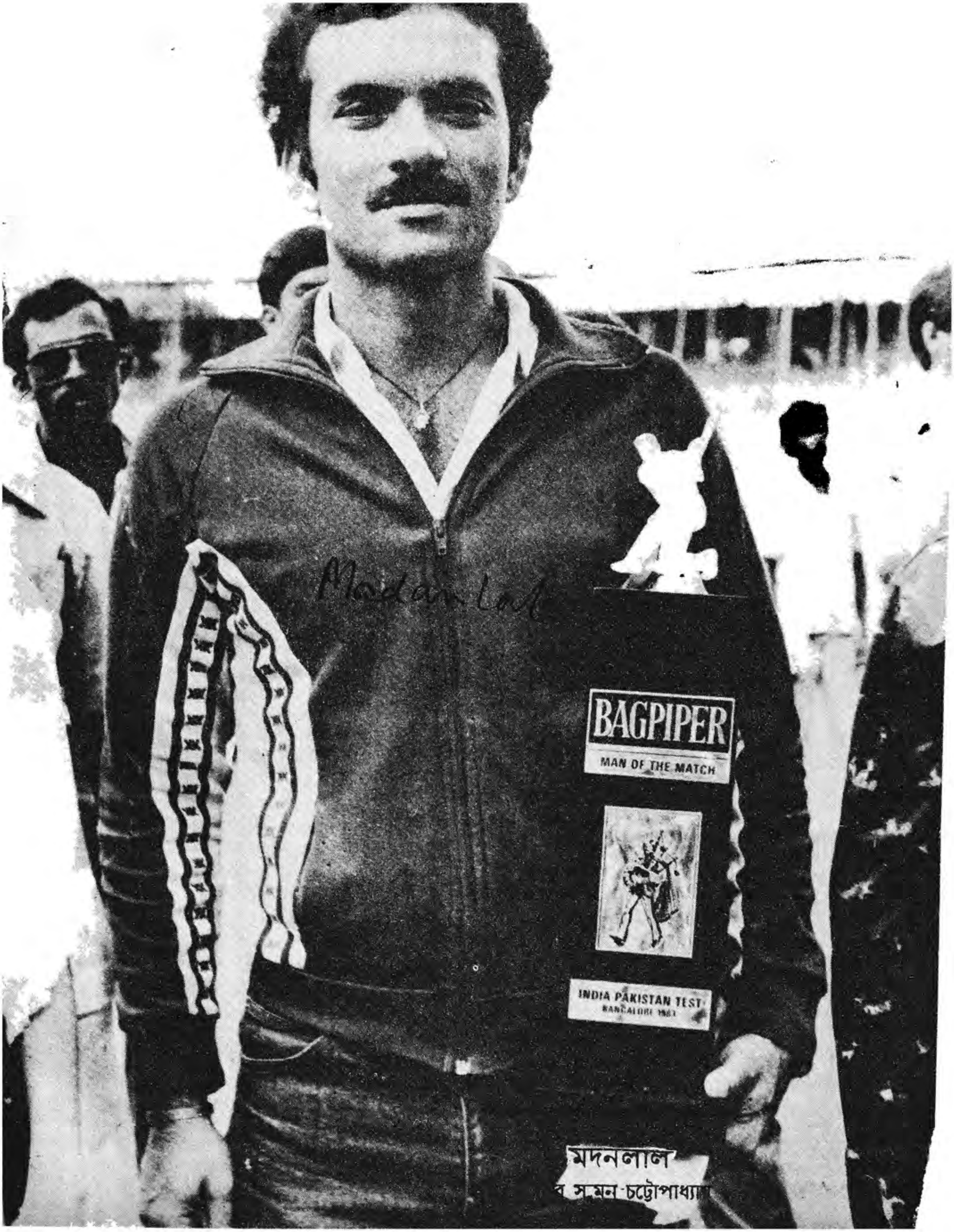

মদনলাল
ব সুমন চট্টোপাধ্যা

স্পোর্টস কুইজ

প্রশ্ন ঃ

(১) বিশ্বের দুটি টাই টেস্ট হয়েছে। দুটি বিষয়ে ঐ দুটি টেস্টে দারুণ মিল আছে—কী কী!

(২) টাই টেস্টের চারজন অধিনায়কের নাম কি?

(৩) প্রথম টাই টেস্টের কোন খেলোয়াড় দ্বিতীয় টাই টেস্টের সময় মাঠে ছিলেন? কোন ভূমিকায় ছিলেন তিনি?

(৪) প্রথম টাই টেস্টের একজন অধিনায়কের নামে সেবার থেকেই একটি ট্রফি চালু হয়। কার নামে—তিনি এখন কোথায়?

(৫) এবারের এশিয়াডে ভারতীয় ফুটবল দল কার কার কাছে হেরেছে? কতো গোলে?

(৬) দশম এশিয়াডের হকিতে ভারতের স্থান কী?

(৭) আট বছর পরে এশিয়াডে সোনা ফিরে পেয়েছেন কোন ভারতীয়—কোন বিভাগে?

(৮) দিল্লীতে অস্ট্রেলিয়ার সঙ্গে ভারতের টেস্টে যদি বৃষ্টির জন্যে একটি বলও করা সম্ভব না হতো তাহলে দিল্লি ও জেলা ক্রিকেট বোর্ডের কি লাভ হতো?

(৯) গ্যারি সোবার্সের একটি রেকর্ডের সঙ্গে কোন ভারতীয়র নাম যুক্ত আছে? কোন বিষয়ে?

(১০) মহিন্দর অমরনাথ কতো বছর বয়সে প্রথম টেস্ট খেলেন?

(১১) এবারের আগে বিশ্বকাপ হকি কোথায় কোথায় হয়েছিল? ফাইনালের ফলাফল—অর্থাৎ প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থান পেয়েছিলো কোন কোন দেশ?

উত্তর

(১) দুটি বিষয়ে—সেবারও এবারের মতো দু দলের প্রথম টেস্টটি টাই হয়েছিল। এবারের মতো সেবারও খেলার শেষ বলটি বাকি থেকে গিয়েছিলো। সেবার অবশ্য আট বলের ওভার ছিলো। এবার ছ বলের।

(২) টাই টেস্টের চারজন অধিনায়ক হলেন—
১৯৬০-৬১ সালে—অস্ট্রেলিয়ার—রিচিবেনো; ওয়েষ্ট ইন্ডিজের—ফ্রাংক ওরেল
১৯৮৬ সালে—অস্ট্রেলিয়ার—অ্যালান বর্ডার; ভারতের—কপিলদেব

(৩) প্রথম টাই টেস্টের খেলোয়াড় ববি সিম্পসন দ্বিতীয় টাই টেস্টের সময় চীপকে উপস্থিত ছিলেন। তিনি এবার ভারতে এসেছিলেন অস্ট্রেলিয়া দলের সহকারী ম্যানেজার হিসেবে।

(৪) সেবার থেকে চালু হয় ওয়েস্ট ইন্ডিজের অধিনায়ক ফ্রাংক ওরেলের নামে ফ্রাংক ওরেল ট্রফি। ওরেল মারা গেছেন।

(৫) ভারতীয় ফুটবল দল এশিয়াডে হেরেছে
দক্ষিণ কোরিয়ার কাছে ৩-0 গোলে
চীনের কাছে ২-১ গোলে
বাহরিনের কাছে ৩-0 গোলে।

(৬) এশিয়াড (দশম) হকিতে ভারত তৃতীয় হয়ে ব্রোঞ্জ পদক পেয়েছে।

(৭) আট বছর আগে ব্যাংকক এশিয়াডে ভারতের কুস্তিগীর কর্তার সিং সোনা জিতেছিলেন। সিওলে তিনি আবার সোনা পেয়েছেন।

(৮) দিল্লি ক্রিকেট সংস্থা বৃষ্টিতে খেলা ভেসে যাবার আশঙ্কায় বীমা করে রেখেছিলো। একটি বলও না হলে তারা ২৫ লক্ষ টাকা পেতো। কিন্তু দেড় দিন খেলা হওয়ায় তারা তা পায় নি।

(৯) গ্যারি সোবার্সের প্রথম শ্রেণীর ক্রিকেটে ছ বলে ছটি ছক্কা মারার সঙ্গে নিজের নামটি যুক্ত করে রেখেছেন রবি শাস্ত্রী। রবি রনজি ট্রফির একটি খেলায় ছ বলে ছটি ছক্কা মেরেছিলেন। সোবার্স এক ওভারে ছটি ছক্কা হাঁকিয়েছিলেন ইংলণ্ডে কাউন্টি ক্রিকেটে।

(১০) মহিন্দর অমরনাথ প্রথম টেস্ট খেলার সুযোগ পান ১৯ বছর বয়সে। ১৯৬৯ সালে।

(১১)

১৯৭১—বার্সিলোনা—	১ পাকিস্তান	
	২ স্পেন	
	৩ ভারত	
১৯৭৩—আমস্টারডাম—	১ হল্যান্ড	
	২ ভারত	
	৩ পশ্চিম জার্মানি	
১৯৭৫—কুয়ালালামপুর—	১ ভারত	
	২ পাকিস্তান	
	৩ পশ্চিম জার্মানি	
১৯৭৮—বুয়েনস এয়ার্স—	১ পাকিস্তান	
	২ হল্যান্ড	
	৩ অস্ট্রেলিয়া	
১৯৮২—বোম্বাই—	১ পাকিস্তান	
	২ পশ্চিম জার্মানি	
	৩ অস্ট্রেলিয়া	

উক্তি

পি. টি. উষা

১০০ মিটার দৌড়ে আমার স্টার্টটা ভালো হয়নি। অন্তত লিডিয়ার থেকে। না হলে আমি লিডিয়াকে হারাতামই। ঐ অবস্থায় যদি আরও ২০ মিটার দৌড়নো যেতো তাহ'লেও আমি সোনা জিততাম কিন্তু তা তো আর হতে পারে না। ১০০ মিটার কি আর ১২০ মিটার হতে পারে?

(সিওল এশিয়াডে শত মিটার দৌড়ে লিডিয়ার কাছে হেরে গিয়ে রুপো পাবার পর)

সাইনি আব্রাহাম

আসলে আমি ব্যাপারটা ঠিক বুঝতে পারি নি। সব জায়গাতেই দেখেছি ১০০ মিটারের পর এক লাল পতাকা পোঁতা থাকে। কিন্তু সিওলে লালের বদলে পোঁতা ছিলো সাদা পতাকা। লাল ফ্ল্যাগটাকে খুঁজতে গিয়েই বোধহয় আমার পা পাশের লেনে চলে গিয়েছিলো।

(সিওলে ১৫০০ মিটার রেকর্ড সময়ে দৌড়ে আসার পর ডিসকোয়ালিফাই হয়ে যাবার ক'দিন পরে ঐ কথা বলেছিলেন।)

কারতার সিং

সোনা জেতায় আমার দারুণ লাগছে। তবে সব থেকে ভালো লেগেছিলো যখন দেখলাম আমি দেশের জন্যে সম্মান কুড়োতে পেরেছি। আমি যখন সোনার পদকটি গ্রহণ করছিলাম, তখন আমাদের জাতীয় পতাকা তোলা হচ্ছিলো—এর থেকে আনন্দের, গর্বের জিনিস আর কী হতে পারে!

(সিওল এশিয়াডে ফ্রি স্টাইল কুস্তিতে সোনা জেতার পর)

দিয়াগো মারদোনা

আমার নামে এ সব বদনাম ছড়ানোর কারণ কি? আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না। সারা পৃথিবীর মানুষ আমাকে ফুটবল খেলোয়াড় হিসেবে জানেন। আমি চাই তাঁরা তাই জানুন।

(বিভিন্ন পত্রিকায় মারদোনা সম্বন্ধে অদ্ভুত সব বাজে খবর বেরোবার পর।)

মিঃ ওয়াংখাড়ে

বোম্বাইয়ে অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে ৩৩তম সেঞ্চুরিটি করে গাভাসকার আমাদের বিপদে ফেলেছেন। এতো তাড়াতাড়ি আর একটা হীরে জোগাড় করে তা সেট করে দেওয়া সম্ভব নাকি? বত্রিশটি সেঞ্চুরির ৩২টি হীরে সেট করা স্মারকটিই গাভাসকারকে নিতে হবে।

(স্মারক উপহার দেবার আগের দিন গাভাসকার সেঞ্চুরি করে বসার পর)

অ্যালান বর্ডার

আমাদের জয় এবং ভারতের হারের মধ্যে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন একজনই। তিনি আর কেউ নন—রবি শাস্ত্রী। রবি না থাকলে অবস্থা অন্যরকম হতে পারতো।

(ভারত-অস্ট্রেলিয়ার টেস্ট মরশুম শেষ হয়ে যাবার পর।)

কপিলদেব

একদিনের ক্রিকেটে আমরা জিতেছি। টেস্ট ক্রিকেটেও জেতা উচিত ছিলো। কিন্তু তা হলো না কয়েকজন খেলোয়াড়ের জন্যে। তাঁরা দলের চেয়ে নিজের স্বার্থই বেশি করে দেখেছেন।

(ভারত-অস্ট্রেলিয়ার টেস্ট মারশুমের পর)

তোমাদের জিজ্ঞাসা

রথীন্দ্রনাথ দে (জি. টি. রোড, পশ্চিম কোন্নগর, হুগলী)

প্রশ্ন : বর্তমান বিশ্বের সেরা পাঁচজন অধিনায়কের নাম জানতে চাই।

উত্তর : অ্যালান বর্ডার, ইমরাণ খান, কপিলদেব, জেরমি কোনি ও মাইক গ্যাটিং।

হিমাদ্রি চক্রবর্তী (বেলঘরিয়া, কলকাতা-৫৬)

প্রশ্ন : ১৯৫২ সালে ইংলন্ডের কোন বোলার ভারতের চার জন খেলোয়াড়কে শুরুতেই আউট করে দিয়েছিলেন? হ্যাট্রিক হয়েছিলো কী?

উত্তর : ফ্রেডি ট্রুম্যান। না, হ্যাট্‌ট্রিক হয় নি।

মানস কুমার চিনি (মেচেদা রেল কলোনি, মেদিনীপুর)

প্রশ্ন : কোন কোন ভারতীয় ব্যাটসম্যান জীবনের প্রথম টেস্টে সেঞ্চুরি করেছেন?

উত্তর : জীবনের প্রথম টেস্টে সেঞ্চুরি করেছেন–লালা অমরনাথ, আব্বাস আলি বেগ, হনুমন্ত সিং, এ. জি কৃপাল সিং, দীপক সোধন, গুণ্ডাপ্পা বিশ্বনাথ, সুরিন্দর অমরনাথ ও মহম্মদ আজহারউদ্দিন।

অনুরাধা মিত্র (হরিসভা হিন্দু বালিকা বিদ্যালয়, বর্ধমান)

প্রশ্ন : এমিল ও ডানা জ্যাটোপেক সম্বন্ধে জানতে চাই।

উত্তর : ওঁদের ওপর কিছু লেখা ছাপা হয়েছে। আরও হবে।

নন্দিতা সরকার (আঁখিরাপাড়া, বালুরঘাট)

প্রশ্ন : বিশ্বকাপ ফুটবল কোথায় কোন কোন সালে হয়েছে তার তালিকা তো কয়েক মাস আগেই ছাপা হয়েছে। তবু আবার ছেপে দেওয়া হলো–

১৯৩০	সালে	–উরুগুয়েতে
১৯৩৪	সালে	–ইতালিতে
১৯৩৮	সালে	–ফ্রান্সে
১৯৫০	সালে	–ব্রাজিলে
১৯৫৪	সালে	–সুইজারল্যান্ডে
১৯৫৮	সালে	–সুইডেনে
১৯৬২	সালে	–চিলিতে
১৯৬৬	সালে	–ইংলন্ডে
১৯৭০	সালে	–মেক্সিকোতে
১৯৭৪	সালে	–পশ্চিম জার্মানিতে
১৯৭৮	সালে	–আর্জেনটিনাতে
১৯৮২	সালে	–স্পেনে
১৯৮৬	সালে	–মেক্সিকোতে

পড়ার সঙ্গে খেলা

সেণ্ট পলস্ স্কুল

শান্তনু বন্দ্যোপাধ্যায়

উত্তর কলকাতার ঐতিহ্যশালী সেণ্ট পলস্ স্কুল পড়াশুনার সঙ্গে তাল রেখে খেলাধূলাতেও সমান পারদর্শিতার পরিচয় দিয়ে চলেছে। এই স্কুলের ছাত্রদের খেলাধূলাতেও যথেষ্ট উৎসাহ রয়েছে। অ্যাথলেটিকস্, সুইমিং, ক্রিকেট, ফুটবল প্রভৃতিতে ছাত্ররা অংশগ্রহণ করে থাকে। অ্যাথলেটিকস্ প্রত্যেক বছর স্পোর্টসে যে সমস্ত ছাত্ররা স্ট্যান্ড করে তাদের ডিস্ট্রিক্টে পাঠানো হয়। এই স্কুলের ছাত্ররা ডিস্ট্রিক্টে ভাল রেজাল্ট করেছে, এবং কয়েকজন বেঙ্গল স্কুল টিমে অংশগ্রহণের সুযোগ পেয়েছে।

ক্যাডবেরি প্রতিযোগিতা ও Y.M.C.A.র আমন্ত্রণ-মূলক প্রতিযোগিতাতেও এই স্কুলের ছাত্ররা অংশগ্রহণ করে থাকে।

সেণ্টপলস্ স্কুল থেকে সেণ্ট্রাল ক্যালকাটা ডিস্ট্রিক্ট স্কুল স্পোর্টস এসোসিয়েশন আয়োজিত সাঁতার প্রতিযোগিতায় প্রত্যেক বছর বেশ কিছু ছাত্র যোগ দেয় এবং এখান থেকে বেঙ্গল টিমে সুযোগ পায় বেশ কয়েকজন ছাত্র। ১৯৮৫তে ইন্ডিয়া টিমেও সুযোগ পেয়েছিল এই স্কুলের ছাত্র। এবছর বেঙ্গলে সুযোগ পেয়েছে চিরঞ্জীত।

এই স্কুলের ক্রিকেট দল প্রত্যেক বছর সি. এ. বি. পরিচালিত ১৫ বছরের নিচের সামার ক্রিকেট প্রতিযোগিতায় যোগ দেয় এবং প্রত্যেক বছর এই প্রতিযোগিতার সেমিফাইনাল ও কোয়ার্টার ফাইনাল অবধি যাবার যোগ্যতা অর্জন করতে পেরেছে। এই টুর্নামেণ্ট থেকে প্রত্যেক বছর ২-৩ জন করে বেঙ্গল সিলেকসানে ডাক পায়।

এই স্কুলের ফুটবল দল D. C. North পরিচালিত ছোটদের চার ফুট দশ ইঞ্চি ইণ্টার স্কুল চ্যাম্পিয়নশিপে অংশগ্রহণ করছে চার বছর ধরে। ৮২তে রানার্স হয় এবং ৮৩তে যুগ্ম চ্যাম্পিয়ন হয়। সেণ্ট্রাল ক্যালকাটা ডিস্ট্রিক্ট স্কুল এসোসিয়েশন পরিচালিত টুর্নামেণ্টেও অংশগ্রহণ করে। ৮৪তে জোনাল ভিত্তিক প্রতিযোগিতায় সেণ্ট পলস্ সিনিয়ার ও জুনিয়ার দুটোতেই চ্যাম্পিয়ন হয় এবং সাবজুনিয়ারে রানার্স হয়। সেণ্ট্রাল ডিস্ট্রিক্ট টিম গঠনের উদ্দেশ্যে ট্রায়াল ক্যাম্পে ৪-৫ জন ছাত্র প্রত্যেক বছর এই স্কুল থেকে ডাক পায়। ৮৫তে সেণ্ট্রাল ক্যালকাটা ডিস্ট্রিক্ট স্কুল দলের অধিনায়ক নির্বাচিত হয় এই স্কুলের ছাত্র সঞ্জীব বসাক। এই বছর ৪ জন ডাক পায় ট্রায়ালে, তার মধ্যে সুযোগ পায় তিন জন। শুভো, অঞ্জন ও দিব্যেন্দু। বঙ্কিম কাপে কয়েকবার সেণ্ট পলস্ খেলেছে। শুভো ব্যানার্জী, দীননাথ বর্মণ ও সুপ্রিয় ভট্টাচার্য বর্তমানে ভাল খেলছে। এই স্কুলের গেম টিচার পাতিয়ালা ফেরত এন. আই. এস এবং বাণীপুর থেকে ফিজিকাল এডুকেশনে ফুলকোর্স ডিপ্লোমাধারি সুকান্ত চক্রবর্তী ছেলেদের জন্য যথেষ্ট পরিশ্রম করেন।

ফুটবল দল—শুভো ব্যানার্জী*, অঞ্জন দত্ত*, সুমিতাভ ধর*, সুপ্রিয় ভট্টাচার্য, রজত দাস, দেবাশিস দাস, প্রভাত বড়াল, দীননাথ বর্মণ, হেনরী, সুজয় মিত্র ঠাকুর, সিরাজ জয়সওয়াল।

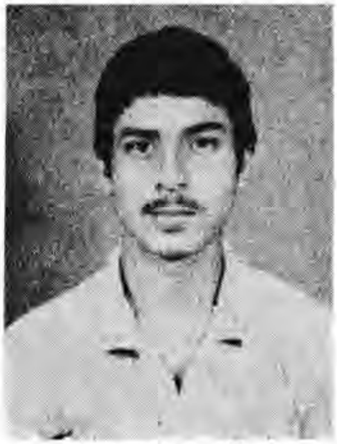

শুভো ব্যানার্জী

সুইমিং—চিরঞ্জীব দত্ত*, দেবাশিস দে*, সম্রাট গাঙ্গুলী*, রাজকুমার ব্যানার্জী, অতনু ভট্টাচার্য, অভিজিৎ বসু, জয় দত্ত.

ক্রিকেট—অঞ্জন মুখার্জী, প্রভাত বড়াল, উত্তম নন্দী, তাপস দে, সুরজিৎ চক্রবর্তী, সৌরভ ভট্টাচার্য, প্রান্তিক ঘোষ, মণীষ সরকার, শৌভিক ঘোষ, চিরঞ্জীব দত্ত, কৌশিক মৈত্র।

অ্যাথলেটিক্স্—হাইজাম্প—সৌমেন মাল, সুমিতাভ ধর।

রানিং বার্ড জাম্প—সৌমেন মাল, শেখর পাল।

২০০ এবং ৪০০ মিঃ রান—শুভো ব্যানার্জী, সুমিতাভ ধর, সুপ্রিয় ভট্টাচার্য, মুস্তাক আহমেদ।

১০০ মিঃ জাম্প—শেখর পাল, সুপ্রিয় ভট্টাচার্য।

৮০০ মিঃ রান—হেনরি, সুমিতাভ ধর।

এই সংখ্যার সব ছবি সুমন চট্টোপাধ্যায়ের তোলা।

ব্রুস লি

ডিভোনো ও ম্যাটেরা

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

তখন ওয়ার্ল্ড ট্রেড অ্যাসোসিয়েটস্-এর অফিসে...
কথাবার্তা শুরু করার আগে আরও একজনের সঙ্গে তোমার আলাপ করিয়ে দিতে চাই লি....
পার্কস, তুমি এখন আসতে পারো!
আমি বুঝতে পেরেছিলাম এটা একটা ফাঁদ!
হ্যালো লি...
...আমি তো বলেছিলাম আবার আমাদের দেখা হবে!
যথেষ্ট হয়েছে, তোমার রসিকতা থামাও ডন। পিস্তল নামাও। এখানে এসো অনেক কিছু আলোচনা করার আছে।
আমি ভদ্র পোশাক পরা ইতরদের সঙ্গে কথা বলতে চাই না!
সতর্ক হবার দরকার নেই মিঃ লি। লড়ার জন্যে তোমায় এখানে ডেকে আনি নি!
আমায় না বলে মিঃ পার্কসকে বরং ও কথা বলুন!
তুমি স্যার ম্যালকম আর তাঁর সঙ্গীদের ইতর বলেছো.... এবার ঠেলা সামলাও!
DIST. BY ASIA FEATURES

ছবিঃ নারায়ণ দেবনাথ

গতিশীল মহাদেশ

খবরের কাগজে প্রথম পাতায় বিশেষ সংবাদ–মহাদেশগুলি স্থির হয়ে বসে নেই। আজকের পৃথিবীর মানচিত্রে অস্ট্রেলিয়া, আফ্রিকা বা আমেরিকা যেখানে আছে, আজ থেকে কয়েক কোটি বছর আগে তারা ঐ জায়গায় ছিল না। অ্যান্টার্কটিকা অভিযানে এমন কিছু তথ্য পাওয়া গেছে যা দেখে ভূবিজ্ঞানীরা মনে করছেন ভারতবর্ষ এককালে অ্যান্টার্কটিকা ও অস্ট্রেলিয়ার সঙ্গে যুক্ত ছিল। মহাদেশগুলির আকৃতি......খবরটা অনেক বড় ছিল। নীলু পুরোটা না পড়েই কাগজটা বন্ধ করে ভাবতে বসল–এটা কি করে সম্ভব? কোথায় অ্যান্টার্কটিকা আর কোথায় ভারতবর্ষ। কি করে এরা একসঙ্গে থাকবে? আর মহাদেশগুলি স্থির হয়ে বসে নেই, কথাটার মানে কি? তার মানে মহাদেশগুলির তলায় অসংখ্য চাকা লাগানো আছে আর যে যেখানে পারছে ঘুরে বেড়াচ্ছে? অসংখ্য প্রশ্নে নীলুর মাথাটা ভরে গেছে। তবে একটা জিনিস মনে হচ্ছে, বিজ্ঞানীরা সত্যিই এমন কিছু তথ্য পেয়েছেন যার ওপর ভিত্তি করে এ ধরনের চাঞ্চল্যকর খবর তাঁরা দিয়েছেন। অত ভাবনা-চিন্তা করে লাভ নেই, এদিকে স্কুলে যাবার সময় হয়ে গেল। আজ তো ভূগোলের ক্লাস আছে, ভুবনবাবুকে এ ব্যাপারটা জিগ্যেস করব। তিনি মনে হয় ব্যাপারটা বলতে পারবেন।

ভূগোলের ক্লাসে ভূগোলের মাস্টারমশাই ভুবনবাবু বেশ কয়েকটা মানচিত্র নিয়ে ক্লাসে ঢুকলেন। ভুবনবাবু সাধারণতঃ মানচিত্র না দেখিয়েই পড়ান। আজ আবার কি হলো? নীলু মনে মনে ভাবছে, একবার স্যারকে জিগ্যেস করবে কিনা–মহাদেশগুলির ঘুরে বেড়ানোর খবরটা কতটা সত্যি। নীলুর প্রশ্ন করার আগেই মনে হয় ভুবনবাবু নীলুর মনের কথাটা বুঝতে পেরেছিলেন। তাই ভূগোলের বইটা একটু নাড়াচাড়া করে টেবিলের ওপর রেখে দিয়ে বললেন–আজ আমি তোমাদের একটু অন্য ধরনের ভূগোল পড়াব। আজকের কাগজে তোমরা নিশ্চয়ই দেখেছ, একটা খবর বেরিয়েছে যাতে বিজ্ঞানীরা বলছেন, কোনো মহাদেশই তার নিজের জায়গায় স্থির হয়ে বসে নেই। এটা এক ধরনের চাঞ্চল্যকর ঘটনা। কবে থেকে আর কিভাবে এরা ঘোরাফেরা করছে, সে সম্বন্ধে তোমরা কি জানতে চাও?

নীলু, মিতুল, রাজকুমার সবাই খুব খুশি। সবাই একসঙ্গে বলে উঠল–হ্যাঁ, হ্যাঁ।

সব থেকে বেশি খুশি হলো নীলু। কারণ যে সমস্যা নিয়ে সারা সকাল নীলু মাথা ঘামিয়েছে, তার সহজ সমাধান এমন ভাবে হয়ে যাবে তা ভাবতেই পারছে না।

মহাদেশগুলি কিভাবে ঘোরাফেরা করছে, নতুন ভূত্বক তৈরি হয়েও পৃথিবীর আয়তন কেন স্থির রয়েছে এইসব প্রশ্নের আলোচনার আগে একটু গোড়ার দিকের কথা জানা দরকার। কোন মহাদেশের চেহারা কি রকম, কিভাবে তারা রয়েছে এ সব ধারণা আজ থেকে চারশো বছর আগেও ছিল না। আজকের যে মানচিত্র তোমরা দেখছ তা তৈরি হয়েছিল ষোড়শ শতাব্দীতে। ১৬২০ সালে ফ্রান্সিস বেকন পৃথিবীর চেহারাটা

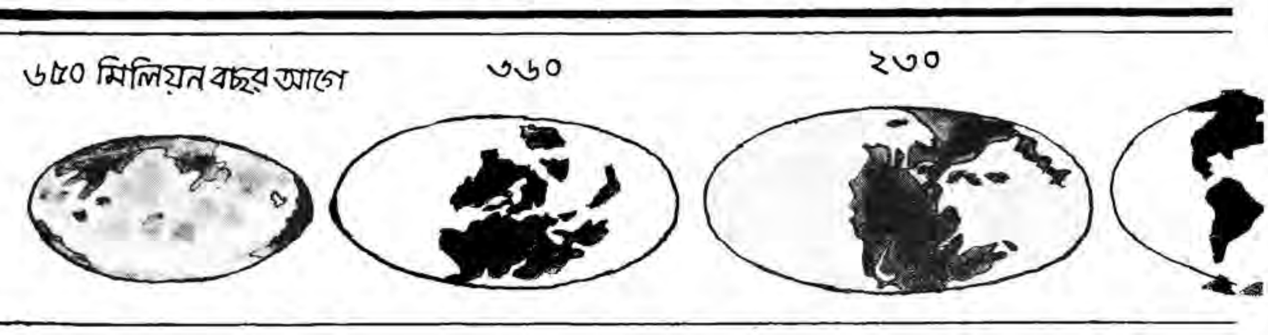

চাপা পড়ে কয়লা

ডাইনোসারস

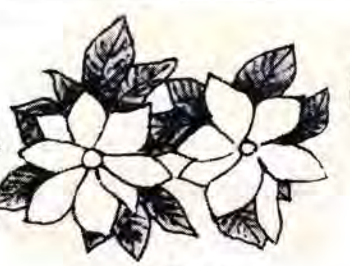

ফুল

মানুষের মাথার খুলির বিবর্তন

সুনীত রায়

দেখে বললেন, কোনো এককালে দক্ষিণ আমেরিকার পূর্ব প্রান্ত আর আফ্রিকার পশ্চিম প্রান্ত একসঙ্গে জুড়ে একটা বৃহৎ মহাদেশ ছিল। কারণ এই দুটো দেশের আকৃতি এমন ধরনের যেন দেখলে মনে হয় একটি অপরটির সঙ্গে যেন খাপে খাপ আটকে যাবে। সে সময়ে অবশ্য তাঁর এই কথা কেউই বিশ্বাস করেনি। কারণ যে কোনো মতবাদ প্রতিষ্ঠিত করতে হলে তার জন্যে চাই বিজ্ঞানভিত্তিক যুক্তি আর প্রমাণ। এই ধরনের কোনো প্রমাণ বেকনের হাতে ছিল না। তারপর বেশ কয়েকশো বছর কেটে গেলো। ইতিমধ্যে আর কোনো বিজ্ঞানী এই বিষয়টাকে খুব একটা গুরুত্ব দেননি। তারপর হঠাৎ বিংশ শতাব্দীর প্রথমভাগে আবহাওয়া-বিজ্ঞানী আলফ্রেড ওয়েগনারের কাছে বিষয়টি খুবই উৎসাহজনক বলে মনে হলো। বহু পরিশ্রম করে বহু তথ্য সংগ্রহ করে তিনি একটা বই লিখলেন। ১৯১৫ সালে 'মহাদেশ ও মহাসাগরের উৎপত্তি' নামে বইটি প্রকাশিত হলো। ভূতাত্ত্বিক ও জীবাশ্মের ওপর ভিত্তি করে তিনি বোঝাতে চাইলেন, পৃথিবীর জন্মের পর থেকে আজ অবধি চেহারার বহু পরিবর্তন হয়েছে। আর এই পরিবর্তন সম্ভব হয়েছে একমাত্র মহাদেশীয় গতিশীলতার জন্যে।

আজ থেকে ২৫ কোটি বছর আগে সব কটি মহাদেশ ও মহাসাগর একসঙ্গে ছিল (চিত্র:১)। তখন এই সুবৃহৎ মহাদেশটির নাম ছিল প্যাঞ্জিয়া আর সুবৃহৎ মহাসাগরটির নাম ছিল প্যান্থালাসা। প্যাঞ্জিয়ার আয়তন ছিল প্রায় ১৫ কোটি বর্গ কি.মি.। প্যাঞ্জিয়ার চেহারাটা ছিল অনেকটা এ ধরনের। একদম উত্তরে গ্রীনল্যান্ড সহ উত্তর আমেরিকা। তার তলায় আরব ও ভারত ছাড়া ইউরেশিয়া। এর তলায় দক্ষিণ আমেরিকা আর আরব সহ আফ্রিকা। আরও নিচে অর্থাৎ একদম দক্ষিণ ভাগে পড়ল অ্যান্টার্কটিকা, অস্ট্রেলিয়া, ভারত আর মাদাগাস্কার।

আজ থেকে ২০ কোটি বছর আগে এই বিশাল প্যাঞ্জিয়ার মাঝ বরাবর ফাটল শুরু হয়। প্যাঞ্জিয়া দুটো ভাগে ভেঙে যায়। একটা অংশ উত্তর দিকে চলে যায়, তার নাম হলো লরেসিয়া আর অপরটি দক্ষিণ দিকে নেমে আসে, তার নাম হলো গন্ডোয়ানা। উত্তর আমেরিকা, গ্রীনল্যান্ড আর ইউরেশিয়া নিয়ে তৈরি হলো লরেসিয়া। আফ্রিকা, দক্ষিণ আমেরিকা, অস্ট্রেলিয়া, অ্যান্টার্কটিকা আর ভারত নিয়ে তৈরি হলো গন্ডোয়ানা ল্যান্ড। ভারতবর্ষে এক উপজাতি ছিল যাদের নামই ছিল 'গন্ড'। আর এই 'গন্ড' থেকেই গন্ডোয়ানা। লরেসিয়া আর গন্ডোয়ানা ল্যান্ডের সঙ্গে তৈরি হলো আটলান্টিক মহাসাগর। গন্ডোয়ানা আবার দুটো ভাগে ভেঙে গিয়ে তৈরি করল ভারত মহাসাগর। দুটো ভাগের একভাগে পড়ল দক্ষিণ আমেরিকা আর আরব সহ আফ্রিকা। অপরভাগে রইল অ্যান্টার্কটিকা, অস্ট্রেলিয়া আর ভারত।

এই চেহারায় পৃথিবীর মানচিত্রটা বেশ কিছুদিন মনে হয় স্থির ছিল। তারপর শুরু হলো আমূল পরিবর্তন। সাড়ে তেরো কোটি বছর আগে ভারতবর্ষ অ্যান্টার্কটিকা থেকে ভেঙে

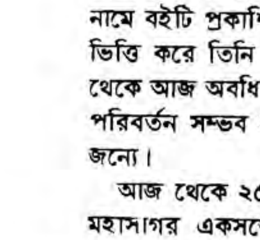

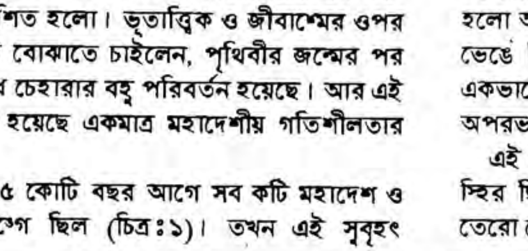

আজকের পৃথিবী

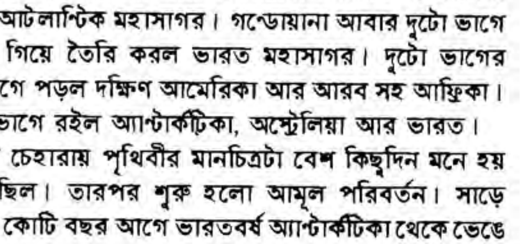

৫০ মিলিয়ন বছর পরে কি হবে

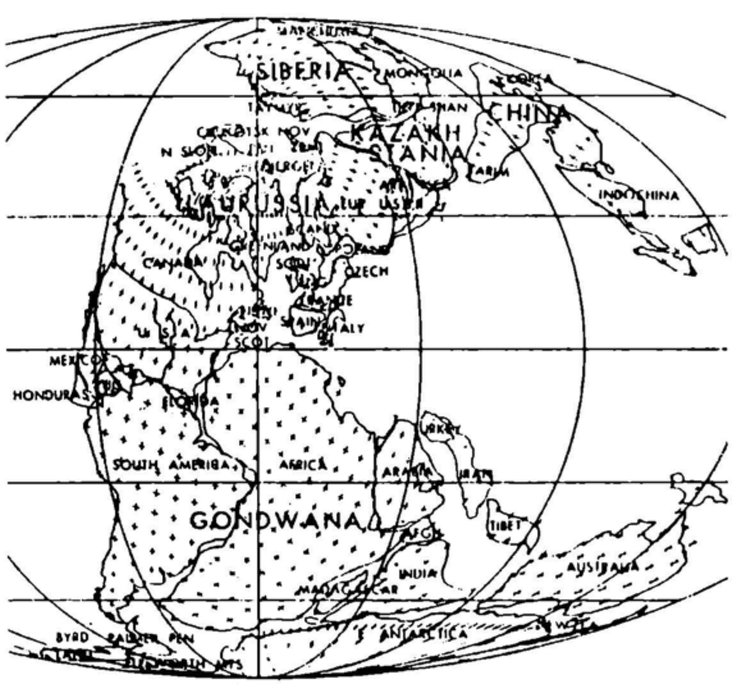

২৫ কোটি বছর আগে মহাদেশের অবস্থান।

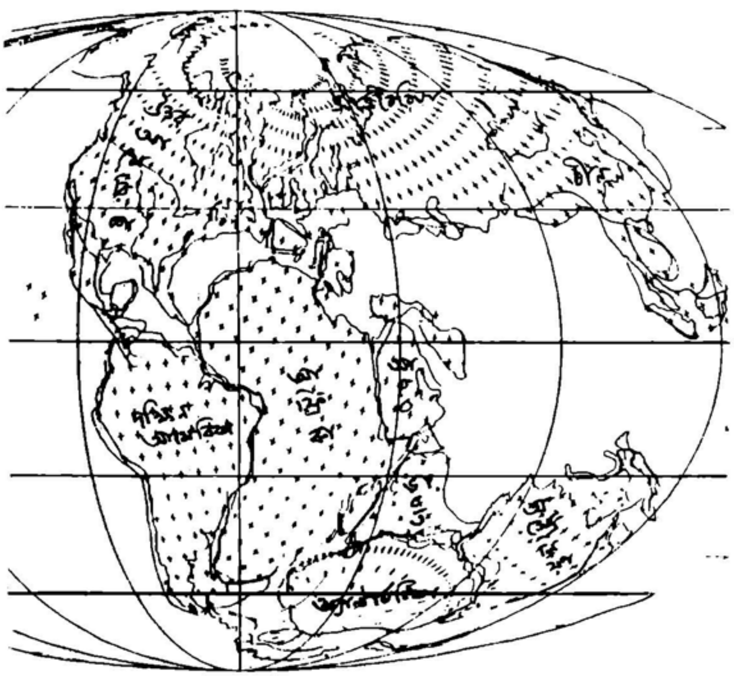

১৫ কোটি বছর আগে মহাদেশের অবস্থান।

গিয়ে উত্তর দিকে চলতে শুরু করল। প্রায় সাড়ে ছ'কোটি বছর আগে আমেরিকা ইউরেশিয়া থেকে আর দক্ষিণ আমেরিকা আফ্রিকা থেকে ভেঙে বেরিয়ে এল। পরে যখন উত্তর আমেরিকা আর দক্ষিণ আমেরিকা একসঙ্গে জুড়ল তখন আবার অস্ট্রেলিয়া অ্যান্টার্কটিকা থেকে ভেঙে বেরিয়ে গেল। দু'কোটি বছর আগে আফ্রিকা থেকে আরব বেরিয়ে এসে এশিয়ার সঙ্গে জুড়ে গেল।

আচ্ছা স্যার, এতগুলো মহাদেশ যে একসঙ্গে ছিল, আর ঠিক এইভাবেই যে ছিল তা ওয়েগনার সাহেব কি ধরনের ভূতাত্ত্বিক আর জীবাশ্মের প্রমাণ থেকে বুঝতে পেরেছিলেন– কথাগুলো বলেই মিতুল খুব মনোযোগ সহকারে ভুবনবাবুর মুখের দিকে উত্তরের আশায় বসে রইল।

৫৭ কোটি বছর আগে যে পর্বতশ্রেণী সৃষ্টি হয়েছিল তা আজও অ্যান্টার্কটিকা আর অস্ট্রেলিয়ার মধ্যে বিদ্যমান। যদিও তারা আজ বহুদূরে সরে গেছে। একই ধরনের পর্বতশ্রেণী দক্ষিণ আমেরিকা আর আফ্রিকার মধ্যে দেখতে পাই। ২৮ কোটি বছর আগে দক্ষিণ-পশ্চিম ভারতে এক বিশেষ ধরনের পাললিক শিলাস্তর তৈরি হয়েছিল। সেই একই সময়ের শিলাস্তর উত্তর-পশ্চিম অস্ট্রেলিয়ার মধ্যে দেখতে পাওয়া গেছে। বিভিন্ন মহাদেশগুলি যে একসময়ে একসঙ্গে ছিল এগুলি তারই ভূতাত্ত্বিক প্রমাণের কয়েকটি উদাহরণ। জীবাশ্মের প্রমাণ বলতে হলে অস্ট্রাকডের কথা বলতে হয়। এই অস্ট্রাকড জাতীয় প্রাণীটি মিষ্টি জলে বাস করত। নোনা জলের সংস্পর্শে এলেই মরে যেত। সুতরাং এ হেন প্রাণীর সমুদ্রের মধ্যে বেঁচে থাকাটা অসম্ভব ব্যাপার। তিরিশটি বিভিন্ন জাতের অস্ট্রাকড জীবাশ্ম দক্ষিণ আমেরিকার ব্রাজিলের পূর্ব প্রান্তে আর আফ্রিকার গ্যারন উপত্যকায় পাওয়া গেছে। আজকের মানচিত্রটা খুললে দেখতে পাবে কোথায় দক্ষিণ আমেরিকা আর কোথায় আফ্রিকা। দুটো দেশের মধ্যে দিয়ে বয়ে গেছে আটলান্টিক মহাসাগর। এখন প্রশ্ন হচ্ছে কি করে প্রাণীটির জীবাশ্ম দুটো দেশেই একই সময়ে ও একই শিলাস্তরে পাওয়া গেল? একমাত্র উত্তর অনুমান করা যেতে পারে যে ঐ সময়ে দুটো দেশ একসঙ্গে ছিল। এ ছাড়া আরও অনেক জীবাশ্মের প্রমাণ পাওয়া গেছে, তা খানিকটা অপ্রাসঙ্গিক বলে আলোচনা করছি না। কারণ জীবাশ্ম বা ভূতাত্ত্বিক প্রমাণ–যা দেখিয়ে আলফ্রেড ওয়েগনার মহাদেশীয় গতিশীলতা প্রমাণ করতে চেয়েছিলেন তা অনেক বৈজ্ঞানিকই মেনে নেননি। ওয়েগনারের 'গতিশীল মহাদেশ' মতবাদ তাঁর জীবিতকালে স্বীকৃতি না পেলেও ষাটের দশকে যখন সমুদ্রবিজ্ঞান নিয়ে গবেষণা শুরু হলো তখন দেখা গেল ওয়েগনার যা বলেছিলেন তা সত্যিই ঠিক। মহাদেশগুলি আগেও স্থির ছিল না এখনো স্থির নেই।

মহাদেশ ও মহাসাগরের গতিশীলতার জন্যে সমুদ্রতলের বিস্তৃতিই একমাত্র কারণ বলে বিজ্ঞানীরা মনে করছেন।

পৃথিবীটাকে যদি লম্বালম্বি কেটে ফেলা হয় তাহলে দেখা যাবে এর মধ্যে রয়েছে তিনটি প্রধান স্তর। প্রথম হলো 'ক্রাস্ট', যাকে আমরা ভূত্বক বলি, তারপর এল 'ম্যান্টেল'-এর মধ্যে রয়েছে গলিত ম্যাগমা আর শেষে রয়েছে 'কোর' অর্থাৎ পৃথিবীর অন্তঃস্তল। আগে ধারণা ছিল, ক্রাস্ট ব্যাসল্ট আর গ্রানাইট শিলা দিয়ে তৈরি। এটি সম্পূর্ণ অভঙ্গুর আর অপরিবর্তনীয়। বর্তমানে ধারণাটা বদলে গেছে। ক্রাস্টটা অনেকগুলো প্লেটের সমন্বয়ে তৈরি। অনেকটা মোজাইক করা মেঝের মতো। এক একটা মোজাইক পাথর অপরটির সঙ্গে জুড়ে জুড়ে যেমন ঘরের মেঝে তৈরি হয়, অনেকটা সেরকমভাবে বেশ কয়েকটা প্লেট জুড়ে তৈরি হয়েছে ভূত্বক। এ প্রসঙ্গে বলে রাখি প্লেট আর মহাদেশ কিন্তু এক নয়। মহাদেশ আর মহাসাগরকে একসঙ্গে করেই বলা হচ্ছে প্লেট। প্লেটগুলির চওড়া হলো ৬০ মাইল। এককথায় বলতে গেলে প্লেটগুলি ক্রাস্ট ছাড়িয়ে ম্যান্টেলের উপরিভাগের কিছু অংশ পর্যন্ত বিস্তৃত। আগেই বলেছি, ম্যান্টেলের মধ্যে স্থিতিস্থাপক গলিত ম্যাগমা রয়েছে। এখন তাহলে প্লেটগুলি ম্যান্টেলের গলিত লাভার ওপর ভাসছে। সুতরাং, দেখতে পাচ্ছি মহাদেশ আর মহাসাগর সবটাই ভাসছে ম্যান্টেলের গলিত লাভার ওপর। আর এটা নিশ্চয়ই জানো যে কোনো জিনিস যদি ভাসমান হয়, তখন তাকে তো আর স্থির বলা যায় না। প্রত্যেকটি প্লেটের মধ্যে একটা গতি রয়েছে যা একে অপরের সঙ্গে আনুপাতিক ও অতি ধীর।

ভূবিজ্ঞানী রবার্ট এস. ডিয়েটজ্ সমুদ্রতলের বিস্তৃতি দিয়ে সুন্দর ভাবে বুঝিয়েছেন কিভাবে প্লেটগুলি চলাফেরা করছে। প্লেটগুলির চওড়া সর্বত্র সমান হয় না। বিশেষ করে মহাসাগরের মধ্যে প্লেটগুলি পাতলা হয়ে যায়। এখন এই

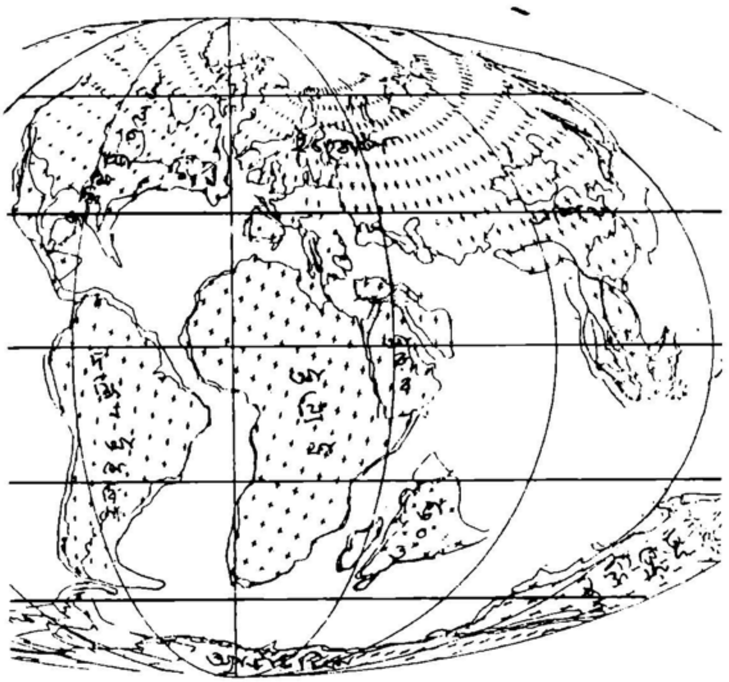

৬.৫ কোটি বছর আগে মহাদেশের অবস্থান।

দুটো প্লেটের পাতলা অংশের সংযোগস্থলে যদি ফাটল বা ভাঙন দেখা দেয়, তাহলে ঐ ফাঁকা অংশ দিয়ে গরম লাভা আগ্নেয়গিরির মতো ম্যান্টেলের ভেতর থেকে বেরিয়ে আসবে। তারপর এই গলিত লাভা ঠান্ডা হয়ে যখন জমে যাবে তখন তৈরি হবে নতুন ভূত্বক। এখন দুটো প্লেটের মধ্যে যদি ফাটলের পরিধিটা বেশি হয় তাহলে এই নতুন ভূত্বক অনেকটা

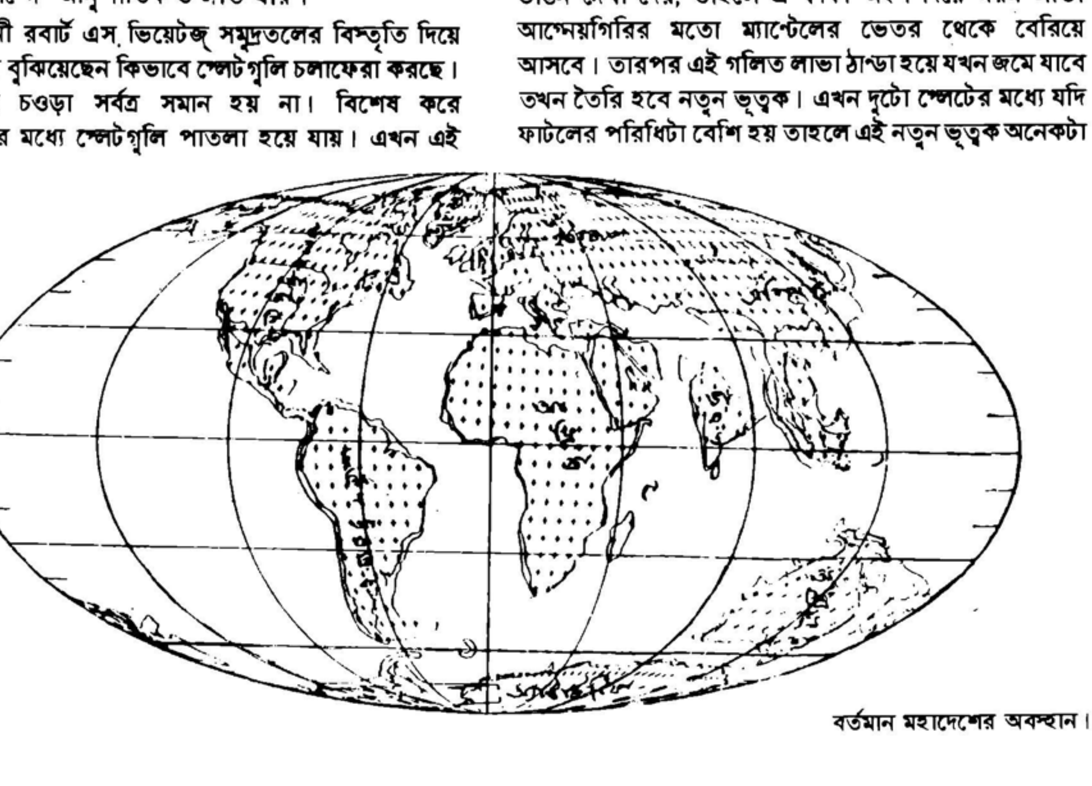

বর্তমান মহাদেশের অবস্থান।

ক্রাইম সিরিজ

সম্পূর্ণ নতুন ধরনের বই। শার্লক হোমসের মতো তীক্ষ্ণ বুদ্ধি, জেমস বন্ডের মতো লড়িয়েদের নিয়ে একটির পর একটি মোট ষোলটি বই বেরিয়েছে। যে কোনো গোয়েন্দা উপন্যাসও হার মানবে এর কাছে। উত্তেজনায় টানটান, রোমাঞ্চে ভরপুর সব কান্ডকারখানা। লিখেছেন–

ধ্রুবজ্যোতি রায়চৌধুরী

বার বার পড়ার এবং প্রিয়জনকে উপহার দেবার মতো ষোলটি বই দাম মাত্র সাত টাকা করে।

বুলেটের শিস্
উজ্জ্বল নীল মৃত্যু
উড়ন্ত বাজ
জ্বলন্ত আগুন
অদৃশ্য কালো হাত
মৃত্যুদূতের শেষ প্রহর
শকুনেরা ওৎ পেতে
রুপোলী বিছের কামড়
প্রবাল দ্বীপের বিভীষিকা

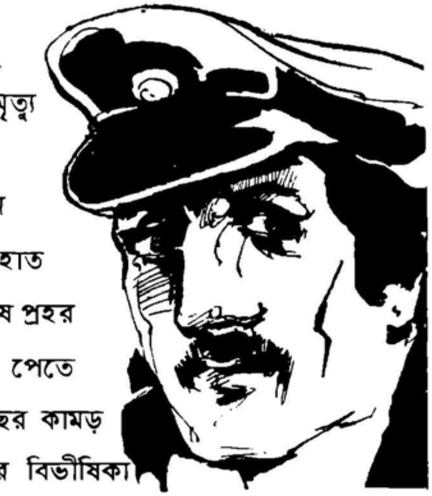

নরহত্যা
গুপ্তহত্যা
রাত্রির কালো দূত
নিয়ত বিপন্ন মৃত্যু
হাঙরেরা রক্তমাখা ঠোঁটে
কালো কালো শিকারী বেড়াল
ও একুশ নম্বর বাংলো

দেব সাহিত্য কুটীর প্রাঃ লিঃ
২১, ঝামাপুকুর লেন, কলি-৯

জায়গা অধিকার করে নেবে। এইভাবে সমুদ্রতলের বিস্তৃতি হয়। এখন এই নতুন ভূত্বক নিজের জায়গায় স্থির থাকার জন্যে আশেপাশের ভূত্বককে ধাক্কা মারবে। তার ফলে একটি প্লেটের সঙ্গে আশেপাশের প্লেটের ধাক্কাধাক্কি হবে। কেউই তখন নিজের জায়গায় স্থির থাকতে পারছে না। এভাবেই মহাদেশ আর মহাসাগরগুলি গতিশীল হয়ে পড়ছে।

আপাতদৃষ্টিতে মনে হয়, এভাবে যদি নতুন ভূত্বক ক্রমান্বয়ে তৈরি হয় তাহলে পৃথিবীর আয়তন কি বেড়ে যাবে? কিন্তু গত কয়েক কোটি বছরেও আয়তনের কোনো পরিবর্তন হয়নি। তা কি করে সম্ভব হলো? একটা ছোট্ট উদাহরণ দিলে ব্যাপারটা পরিষ্কার হয়ে যাবে। মনে কর একটা ছোটো টেবিলের ওপর তোমার দশজন বন্ধু মিলেমিশে দাঁড়িয়ে আছে। এখন এর ওপর একজন বেশী হলেই টেবিলটা ভেঙে যাবে। তোমার খুব ইচ্ছে টেবিলের ওপর উঠে বন্ধুদের সঙ্গে গল্পগুজব করবে। সুযোগের অপেক্ষায় থেকে থেকে, যেই না একটু ফাঁক দেখতে পেয়েছ– অমনি তড়াক করে টেবিলের ওপর উঠে বসলে। এদিকে সবাই থাকতে চায়, কেউ নামতে চায় না। এর ফলে শুরু হয়ে গেলো ধাক্কাধাক্কি আর মারপিট। এখন তোমাদের মধ্যে যে দুর্বল সে অত হৈচৈ সহ্য করতে না পেরে নিজে থেকেই নেমে পড়বে। আর যেই একজন নেমে গেল, অমনি আবার সাম্যাবস্থা ফিরে এল টেবিলের মধ্যে। ঠিক এইভাবে নতুন ভূত্বকের আবির্ভাবের পর শুরু হয় প্লেটে প্লেটে ধাক্কাধাক্কি। এখন ভূত্বকের যে অংশটা পুরানো হয়ে গেছে অর্থাৎ দুর্বল হয়ে পড়েছে সেই অংশটা গভীর সমুদ্রে গুটিয়ে গিয়ে ফুটন্ত ম্যান্টেলের লাভার মধ্যে বিলীন হয়ে যায়। এভাবে নতুন ভূত্বকটি জায়গা করে নিল। ক্রমাগতঃ সমুদ্রতলের বিস্তৃতি, সেই সঙ্গে নতুন ভূত্বকের আবির্ভাব সত্ত্বেও পৃথিবীর আয়তনটা স্থির রয়েছে।

বর্তমানকালে মহাদেশ আর মহাসাগরের যা চেহারা দেখতে পাচ্ছি, আজ থেকে ৫ কোটি বছর পর সম্পূর্ণ বদলে যাবে। অস্ট্রেলিয়া উত্তর দিকে এগিয়ে গিয়ে মালয়েশিয়ার ধার বরাবর এসে এশিয়ার সঙ্গে ধাক্কা খাবে। আফ্রিকা ইউরোপের ধার বরাবর এগোতে শুরু করবে, এর ফলে ভূমধ্যসাগর ছোটো ছোটো হ্রদে পরিণত হবে। পূর্ব আফ্রিকা কেটে বেরিয়ে আসবে আফ্রিকা থেকে। আটলান্টিক ও ভারত মহাসাগর আয়তনে বৃদ্ধি পাবে আর প্রশান্ত মহাসাগর ছোটো হয়ে আসবে। ক্যালিফোর্নিয়ার নিচের দিকে কিছু অংশ যেগুলি সান আন্ডিজের পশ্চিম দিকে পড়েছে–সেটি আলাস্কার দিকে এগুবে। স্বপ্ননগরী লস্ এঞ্জেলস হারিয়ে যাবে।

ভুবনবাবু আরো কিছু হয়তো বলতেন, কিন্তু ঢং ঢং করে স্কুল ছুটির ঘণ্টা পড়তেই ভুবনবাবু থেমে গেলেন। এখনো এই বিষয় নিয়ে প্রচুর গবেষণা হচ্ছে। পরে আরো নতুন কোনো তথ্য পেলে তা নিয়ে আলোচনা করার ইচ্ছে রইল, বলে ভুবনবাবু হনহন করে ক্লাস থেকে বেরিয়ে চলে গেলেন।

ছবি : সুধীর

অমৃতের পুত্র

নন্দলাল ভট্টাচার্য

হ্যাঁরে বিলে, বড় হয়ে তুই কি হবি ?
ঘোড়ার গাড়িতে মা'র কোলে বসে বিলে তখন জানলা দিয়ে দেখছে কলকাতার রাস্তা। ওই ওই সময় বাবার ওই আচমকা প্রশ্ন শুনে একটু থমকে গিয়েই সে বলে, আমি ?

হ্যাঁ, হ্যাঁ তুই-ই।

এবার আর এক মুহূর্তও ভাবনা নয়। বাবার দিকে তাকিয়ে সটান বলে বিলে, বড় হয়ে আমি কোচোয়ান হবো।

সে কি রে ?

হ্যাঁ। কেমন মাথায় প্যাগড়ি বেঁধে গাড়ির সামনে বসবো। হাওয়ায় শন্‌শন্‌ করে চাবুক ঘুরবে আর গাড়ি ছুটবে জোরে গড়গড় করে। সবাই অবাক হয়ে দেখবে আর ভাববে, দেখেছ –কেমন শক্তি ওর।

ছেলের কথা শুনে বিশ্বনাথ দত্ত হো হো করে হেসে উঠলেন। তারপর স্ত্রীকে বললেন, শুনলে, শুনলে তোমার ছেলের কথা।

ভুবনেশ্বরী দেবী ছেলের মাথায় হাত বুলিয়ে বলেন, শুনবো আর কি ? আমি তো তোমায় বলেইছি, শিবের কাছে আমি চেয়েছিলাম একটা ছেলে। কিন্তু শিব আমার কাছে পাঠিয়ে দিয়েছেন একটা ভূত। তা সেই ভূতটা অমন কথা বলবে না তো বলবে কি ?

বিশ্বনাথ দত্ত আবার হেসে বলেন, না–না, বিলে আমাদের ভূত হবে কেন ? ও একদিন মস্ত বড় হবে–দেখে নিও তুমি।

ছেলেকে বুকের মধ্যে আরো টেনে নিয়ে মা বলেন, হলেই ভালো।

কলকাতার সিমলা পাড়ার বিশ্বনাথ দত্ত–নামকরা অ্যাটর্নি। দারুণ পসার তাঁর। অভাবও নেই কিছুরই। কিন্তু প্রথম ছেলেটি খুবই কম বয়সে মারা যাবার অনেক দিন পরও আর কোনো ছেলে না হওয়ায় ভুবনেশ্বরী দেবীর মনের মধ্যে ছিল একটা দুঃখ। তিনি বাবা বিশ্বনাথকে ডাকতে থাকেন একটি ছেলের জন্য। এরই পর জন্ম হয় বিলের। শিবের পুজো করে ছেলে পেয়েছেন বলে তিনি নাম রাখেন তার বীরেশ্বর। পরে বীরেশ্বর নামটা একবারেই চাপা পড়ে যায় স্কুলের নরেন্দ্রনাথ নামের আড়ালে।

চার মেয়ের পর ছেলে। তাই আদরটা তার খুবই বেশি। বকাঝকাটা তাকে কেউই করে না। তাতেই যেন বিলের দুষ্টুমিটা আরো বেড়ে যায়। ওইটুকু ছেলে কিন্তু তার দুষ্টুমির ঠেলায় সবাই যেন পাগল হয়ে ওঠে। মা প্রায়ই রেগে বলেন, শিবের কাছে ছেলে চেয়ে শেষে পেলুম কিনা একটা ভূত। তারপর উঠোনের মধ্যে ছেলেকে বসিয়ে তিনি মাথায় জল ঢেলে বলতেন শিব, শিব।

অবাক কান্ড। মুহূর্তে সব দুষ্টুমি বন্ধ। শান্ত ছেলেটির মতো বসে থাকতো বিলে। তার তখনকার সেই ভাব দেখে সবাই হাসতো।

বিলের কিন্তু সেসবে কোনো ভ্রূক্ষেপই নেই। সে থাকে তার আপন মনে।

সেদিন কোথা থেকে একটা গেরুয়া কাপড়ের টুকরো যোগাড় করে লেংটির মতো পরে সারা বাড়ি দাপিয়ে ঘুরতে থাকে বিলে। মা দেখতে পেয়ে বলেন, ও কিরে, ও কি পরেছিস তুই।

বিলে তখন একপাক ঘুরে বলে, মা, আমি শিব হয়েছি। কেমন লাগছে আমাকে ?

পাগল ছেলের কান্ড দেখে মা হাসবেন কি কাঁদবেন বুঝতে পারেন না। ছেলেকে শুধু কোলের মধ্যে টেনে নিয়ে বলেন, বিলে আমার সত্যিকারেরই শিব।

যত দুষ্টুমিই করুক বিলে–শিব বললেই সে শান্ত। আর শান্ত সে ধ্যান করার সময়। ওই ছোটবেলাতেই ধ্যান করার দিকে তার যেন আশ্চর্য ঝোঁক। কথকঠাকুর, না কার কাছে যেন শুনেছে–আগের দিনে মুনি ঋষিরা ধ্যান করতে বসলে তাঁদের আর কোনো দিকে হুঁশ থাকত না। মাথার জটা একদম গাছের শেকড়ের মতো মাটিতে ঢুকে যেতো।

কথাটা শোনার পরই বিলেরও ঝোঁক হলো সে ধ্যানে বসবে। সত্যি সত্যিই মুনি ঋষিদের মতো চোখ বুজে একদিন সে ধ্যানে বসল। মাঝে মাঝেই কিন্তু তাকিয়ে দেখে মাথা থেকে জটা বেরিয়ে মাটিতে ঢুকেছে কিনা। অনেকক্ষণ ধ্যান করার পরও জটা বেরিয়ে মাটিতে ঢুকল না দেখে বিলে তো কান্না জুড়ে দিলো।

কান্না শুনে ছুটে আসেন মা ভুবনেশ্বরী দেবী। বলেন,কিরে, কী হয়েছে, কাঁদছিস কেন ?

বিলে কাঁদতে কাঁদতেই বলে, কই, আমি তো এতক্ষণ ধ্যান করলুম তবু তো আমার মাথা থেকে জটা বেরুলো না– মাটিতেও জটা ঠেকলো না।

মা কোনোরকমে হাসি চেপে বললেন, সে কি বাবা একদিনে হয়। অনেকদিন অনেকক্ষণ ধরে ধ্যান করলে তবে জটা হবে। এখন তুমি আমার সঙ্গে এসো।

বিলের এই ধ্যানে বসাটা কিন্তু একদিনের ব্যাপার নয়। প্রায়ই সে ধ্যানে বসে। একদিন ছাদের চিলে কোঠায় দরজা বন্ধ করে ধ্যানে বসল বিলে আর তার এক বন্ধু হরি।

ধ্যানে বসেই বিলে একদম তন্ময়। কোনো দিকে তখন তার আর কোনো খেয়ালই নেই। বাইরের কোনো আওয়াজই তখন আর তার কানে আসছে না।

এদিকে অনেকক্ষণ বিলেকে দেখতে না পেয়ে বাড়িতে হুলুস্থূল। খুঁজতে খুঁজতে সবাই শেষে হাজির হয় ছাদে। ছাদে উঠে সবাই দেখে চিলে কোঠার দরজা বন্ধ। সবাই দরজায় ধাক্কা দেয়। ভয়ে হরি তখন কাঠ। একসময় ধাক্কার চোটে দরজা খুলে যায়। হরিও সঙ্গে সঙ্গে দরজার ফাঁক দিয়ে পালায়।

বিলে কিন্তু তখনও সেই একইভাবে বসে আছে, এত যে কান্ড হয়ে গেল সেদিকে তার কোনো খেয়ালই নেই। তাকে বেশ করে ঝাঁকানি দিতে তার সেই ধ্যান ভাঙে।

আরেকদিনও ঘটল প্রায় একই ঘটনা। ছাদের ওই চিলে কোঠাতেই জন কয় বন্ধু নিয়ে ধ্যানে বসেছে বিলে। হঠাৎ কোথা থেকে সেই ঘরে ঢোকে একটা গোখরো সাপ। সাপ দেখেই সবাই চম্পট দেয়। কিন্তু বিলে বসে থাকে ওই একইভাবে।

খবর পেয়ে বাড়ির লোকজন ততক্ষণে উঠে এসেছে ছাদে। তাঁরা দেখেন সেই গোখরো ফণা তুলে দুলছে বিলের সামনে। আর বিলে বসে আছে চোখ বন্ধ করে স্থির হয়ে।

একজন বলে লাঠি নিয়ে আয়, সাপটাকে মারি।

মারবি কি রে? সাপ মারতে গেলে সে যদি ছোবল দেয় বিলেকে?

তাইতো তাহলে কি করা যাবে?

অপেক্ষা করাই যাক। সাপ নিশ্চয়ই চলে যাবে।

মা ভুবনেশ্বরী কান্নাভরা গলায় শুধু বলে চলেছেন, রক্ষা কর শিব, শিব।

একটু বাদেই সাপ মাথা নিচু করে বেরিয়ে যায়। স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে সকলে, মা ছুটে গিয়ে কোলে তুলে নেন তাঁর বিলেকে। চমকে উঠে বিলে বলে, কী ব্যাপার কী হয়েছে?

ওরে তোকে যে আজ সাপে কাটত।

কখন? কোথায়?

কখন আবার, এই তো–এইখানেই। এত বড় গোখরো সাপ। ছেলেকে বুকের মধ্যে নিয়ে বলতে থাকেন মা।

বিলে বলে, কি জানি, আমি তো কিছুই বুঝতে পারিনি। আমি যে ধ্যান করছিলুম।

এইরকমই ছিল তার একাগ্রতা। কোনো জিনিস একবার ধরলে তার গভীরে তলিয়ে যেতে বেশি সময় লাগত না বিলের।

বিলের নাম তখন নরেন্দ্রনাথ। এন্ট্রান্স পরীক্ষা দেবে সেবার। পরীক্ষার ক'দিন আগে বিলে দেখল ইউক্লিডের জ্যামিতির বড় বড় চারটি খণ্ডের একটিও পড়া হয়নি তার। সবাই শুনে বলল, এখনও জ্যামিতি পড়া হয়নি–তাহলে নির্ঘাৎ ফেল।

কেন? কি, এত বড় কথা? ওই চারটি খণ্ডই আজ রাতেই শেষ করব?

ইউক্লিডের জ্যামিতির চারটি খণ্ড এক রাতে পড়া–এ কি ম্যাজিক নাকি? সবাই ঠোঁট বেঁকিয়ে হাসে।

ওদিকে বিলে চারটি খণ্ড নিয়ে ঢোকে ঘরে। দরজা বন্ধ করে জ্যামিতি খুলে বলে, এই বসলুম। শেষ হলে তবে উঠব।

মা এসে ডাকেন, ওরে খাবি আয়।

না, যতক্ষণ না পড়া শেষ হচ্ছে ততক্ষণ খাওয়া নয়। এই আসন থেকে ওঠা নয়।

মা জানেন, ছেলের তাঁর ভীষ্মের প্রতিজ্ঞা, তাই আর না ডেকে চলে যান তিনি।

সকালবেলা দরজা খোলে বিলে। একমুখ হাসি। ইউক্লিডের চার খণ্ড জ্যামিতিই তার পুরোপুরি তৈরি।

এমনি ছিল বিলের জেদ। এমনি ছিল তার পড়ার ধরন।

বিলের পড়া নিয়েই কি কম ঘটনা ঘটেছে? বাড়িতে পড়াচ্ছেন মাস্টারমশাই। তিনি দেখেন দুচোখ বুজে বিলে দুলছে। রাগ হয়ে যায় তাঁর। তিনি পড়াবেন আর ছাত্র কিনা

ঢুলছে। রেগে একটি চড় মারেন তিনি বিলেকে।

চোখ খুলেই বিলে যেন রুখে দাঁড়ায়। আপনি মারলেন যে আমাকে?

ছাত্রের সাহস দেখে মাস্টারমশাই অবাক। তাই তিনি রেগেই বলেন, আবার জিজ্ঞেস করতে লজ্জা করে না? আমি মরছি বকে আর উনি ঘুমোচ্ছেন!

আমি তো ঘুমোইনি।

ঘুমোননি, তবে কি ধ্যান করছিলেন? শেষে ঝলসে ওঠেন মাস্টারমশাই।

আমি আপনার পড়াই শুনছিলুম।

বটে, কেমন শুনছিলি, বল দেখি? বলেই মাস্টারমশাই পড়া ধরতে শুরু করেন। অবাক! তিনি দেখেন বিলে সব শুনেছে ঠিক ঠিক। গড় গড় করে বলে যাচ্ছে সে—এতক্ষণ ধরে যা পড়িয়েছেন তিনি।

এবার লজ্জা পান মাস্টারমশাই। আদর করেন তাঁর ছাত্রটিকে।

স্কুলে পড়ার সময়ও বিলের জীবনে ঘটেছিল প্রায় এই ধরনেরই একটা ঘটনা। বিদ্যাসাগরমশাইয়ের মেট্রোপলিটন স্কুলের ছাত্র তখন সে। ক্লাসে যখন মাস্টারমশাই পড়িয়ে যাচ্ছেন সেইসময়ও বিলে তার বন্ধুদের সঙ্গে গল্প করছে। কিন্তু মজা হচ্ছে, অন্য বন্ধুরা মন দিয়ে তার গল্প শুনছে আর বিলে গল্প করার ফাঁকে ফাঁকেই মাস্টারমশাইয়ের দু চার কথা শুনে নিয়ে পড়াটা তৈরি করে নিচ্ছে।

অনেকক্ষণ ধরেই ফিসফিস আওয়াজ পেয়ে মাস্টারমশাই রেগে ছিলেন। এবার তিনি পড়া ধরতে শুরু করেন। সেদিন বিলে ছাড়া আর কেউই পড়া বলতে পারল না। ফলে মাস্টারমশাই তাকে ছাড়া সবাইকে দাঁড়িয়ে থাকতে বললেন।

মুখ কালো করে সব ছেলে দাঁড়ালো বিলেও উঠে দাঁড়াল তাদের সঙ্গে। তাকে দাঁড়াতে দেখে মাস্টারমশাই বললেন, ওকি, তুমি উঠলে কেন? তোমাকে দাঁড়াতে বলিনি।

বিলে বলে, মাস্টারমশাই, দোষটা আমারই। আমি তো গল্প বলছিলাম। তাই শাস্তিটা আমারই পাওয়া দরকার।

মাস্টারমশাই সেদিন বিলের সততায় মুগ্ধ হয়ে সব ছেলেকেই বসতে বলেছিলেন।

এই মেট্রোপলিটন স্কুলেই একদিন বিলেকে কাঁদতে দেখে বিদ্যাসাগরমশাই এগিয়ে এসে জিজ্ঞেস করেন, কিরে, কি হয়েছে, তুই কাঁদছিস কেন?

দেখুন না, মাস্টারমশাই আমাকে শুধু শুধু মারলেন। এই দেখুন, টেনে আমার কান ছিঁড়ে দিয়েছেন, এখনও রক্ত বেরুচ্ছে।

বিদ্যাসাগরমশাই দেখেন, সত্যিই বিলের কান থেকে রক্ত বেরুচ্ছে। তিনি বলেন, কি করেছিলি—কেন মেরেছেন মাস্টারমশাই তোকে?

বিলে বলে সব। শুনতে শুনতে বিদ্যাসাগরমশাইয়ের মুখটা

বারবার পড়ার মতো দারুণ একটি বই

শান্তিপ্রিয় বন্দ্যোপাধ্যায়ের

মারাদোনা মারাদোনা

শুধু মারাদোনার জীবন-কাহিনীই নয়—এই বইটিতে আছে এবারের বিশ্বকাপের খুঁটি নাটি সব কিছুই। সম্পূর্ণ রেকর্ড আর ছবির অ্যালবাম। দাম মাত্র আট টাকা।

এখনই দরকার এই বইগুলি

শান্তিপ্রিয় বন্দ্যোপাধ্যায়ের

বাদশা গোলাম

পেলে আর ইউসেবিওকে নিয়ে দুর্দান্ত একটি বই। উপন্যাসের চেয়ে আকর্ষণীয় এই বইটি।

হাতের কাছে চাই-ই চাই

ক্লাবের নাম মোহনবাগান
ক্লাবের নাম ইস্টবেঙ্গল
ফুটবল খেলার আইনকানুন
খেলার রাজা ফুটবল

ক্রিকেটের বই তো সব সময়ই চাই

ব্যাটের রাজা গাভাসকার
শীতের দুপুরে দুই প্রতিবেশী
ক্রিকেট খেলার আইন কানুন
তিন পুরুষ

বাড়ি বসে পেতে হলে নিচের ঠিকানায় লেখো—

নিউ বেঙ্গল প্রেস (প্রাঃ) লিঃ

৬৮, কলেজ স্ট্রীট, কলিকাতা ৭০০০৭৩

ছোটদের মনের মত বই

উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী

- টুনটুনির গল্প [৩.০০]

সুকুমার রায়

- খাগড়াই [৩.৫০]

সুখলতা রাও

- ঈশপের গল্প [৩.৫০]

যোগীন্দ্রনাথ সরকার

- হাসিখুশি-১ [৩.০০]
- হাসিখুশি-২ [৩.৫০]
- হাসিরাশি [৪.৫০]
- আষাঢ়ে স্বপ্ন [৩.০০]
- ছোটদের রামায়ণ [৩.০০]
- ছোটদের মহাভারত [৬.০০]

প্রেমেন্দ্র মিত্র

- কুমির সাহেব [৩.০০]

লীলা মজুমদার

- জানোয়ার [৪.০০]

শশিভূষণ দাশগুপ্ত

- শ্যামলা দীঘির ঈশান কোণে [৫.০০]
- ছেলেবেলার বিবেকানন্দ [৪.০০]
- ছোটদের বাল্মীকি রামায়ণ [৬.০০]
- ছোটদের ব্যাসদেব রচিত মহাভারত [৬.০০]

সুনির্মল বসু

- আমার ছড়া [৪.৫০]

স্বামী লোকেশ্বরানন্দ

- ছোটদের সারদাদেবী [৬.৫০]

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর

- বর্ণ পরিচয়–১ম ভাগ [২.৫০]
- বর্ণ পরিচয়–২য় ভাগ [২.৫০]

পূর্ণচন্দ্র চক্রবর্তী

- ছবিতে হিতোপদেশ [৩.০০]
- ছবিতে রামায়ণ [৫.৫০]
- ছবিতে মহাভারত [৬.০০]

শৈলেন্দ্র বিশ্বাস

- আমরা বাঙালী [৪.০০]
- আমাদের দেশবন্ধু [২.২৫]

মনোমোহন চক্রবর্তী

- ছবিতে পৃথিবী ১ [৪.০০]
- ছবিতে পৃথিবী ২ [৪.০০]

ভবানীপ্রসাদ মজুমদার

- মজার ছড়া [৫.০০]

উপেন্দ্রচন্দ্র মল্লিক

- মজার কবিতা [৫.০০]

শৈল চক্রবর্তী

- ছড়ার দেশে টুনটুনি [৬.০০]

গৌরী ধর্মপাল

- চোদ্দ পিদিম [৬.০০]

মীরা বালসুব্রমনিয়ন

- তিনটে তামার পয়সা [৭.০০]

মহেন্দ্রনাথ দত্ত ও প্রভাত বসু

- ছোটদের ছড়া সঞ্চয়ন [৬.০০]

আমার শৈশব

জন্ম থেকে সাত বৎসর পর্যন্ত ছবি সংযোগে **বৃত্তান্ত লেখার বই** [সাধারণ ২৫.০০ ।। শোভন ৪০.০০]

শিশু সাহিত্য সংসদ প্রাঃ লিঃ

৩২এ, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড ঃ কলিকাতা-৯ঃ ৩৫-৭৬৬৯

থমথমে হয়ে ওঠে। তিনি আদেশ দিলেন, তাঁর স্কুলে মাস্টারমশাইরা কোনো ছাত্রের গায়ে হাত দিতে পারবেন না।

ব্যাপারটা হয়েছিল কি, স্কুলে একজন মাস্টারমশাই ছিলেন দারুণ রাগী। ছাত্রদের তিনি প্রচন্ড মারধর করতেন আর মারার সময় নানারকম মুখ বিকৃতিও করতেন। সেই মুখ বিকৃতি দেখে হাসি রাখা দায়। সেদিনও ওইভাবে যখন একটি ছাত্রকে মারছিলেন সেই সময় বিলে তাঁকে দেখে হাসতে থাকে। বিলেকে হাসতে দেখে মাস্টারমশাইয়ের রাগটা তার ওপরই এসে পড়ে। ছাত্রটিকে ছেড়ে তিনি মারতে থাকেন বিলেকে আর বলেন, আর হাসবি, হাসবি আমার দিকে তাকিয়ে।

মাস্টারমশাইয়ের সেই বিকট রূপ দেখে 'আর হাসবো না'– এই কথাটা বলতে পারে না বিলে। ফলে মাস্টারমশাইয়ের রাগের মাত্রাটা যায় আরো কয়েক ডিগ্রি চড়ে। তিনি বিলের কান ধরে বেঞ্চের ওপর দিয়ে টানতে থাকেন। ফলে তার কান থেকে রক্ত পড়তে থাকে। বিলেও এবার রুখে বলে, আমার কান ধরবেন না। আমাকে মারবার আপনি কে?

ওইসময়ই বিদ্যাসাগরমশাই সেখানে এসে জিজ্ঞেস করেন, কিরে কাঁদছিস কেন?

বিলে তাঁর হাতে নিজের বইগুলি তুলে দিয়ে বলে, আমি আর আপনার স্কুলে পড়ব না। এই দেখুন উনি শুধু শুধু মেরেছেন। বলে সব ঘটনা জানায়। তারপরের কথাতো আগেই বলেছি।

বিলে বিদ্যাসাগরমশাইয়ের এই মেট্রোপলিটন স্কুলে ভর্তি হয় তার আট বছর বয়সের সময়। কিন্তু ওই বয়সেই তার মধ্যে ছিল একটা প্রচন্ড জেদ। একটা গোঁ ধরলে, নিজের থেকে না ছাড়লে তা ছাড়ানো ছিল একটা অসম্ভব ব্যাপার। স্কুলে বিলের বুদ্ধি দেখে সব মাস্টারমশাই-ই মুগ্ধ। কিন্তু বিলে গোঁ ধরে সে ইংরেজি পড়বে না মোটেই।

কথাটা শুনে বাড়িতে এক দাদামশাই নৃসিংহ দত্ত বোঝান নানাভাবে। বলেন, ইংরেজি পড়াটা খুব দরকার। ওটা না পড়লে চলবে কি করে?

বিলে কিন্তু সেই যে না বলেছে, আর হ্যাঁ করে না কিছুতেই। কয়েক দিন বাদে অবশ্য নিজে থেকেই বলে, আচ্ছা বেশ, ইংরেজি আমি পড়ব। আর একবার পড়া শুরু করার পর তার সংগে অন্য কেউ আর পেরে ওঠে না। শুধু ইংরেজি নয় বাংলা, সংস্কৃত সব বিষয়েই বিলে ছিল এক নম্বর।

শুধু লেখাপড়ায় নয়, বিলে ছিল সবকিছুতেই এক নম্বর। খেলাধুলো, দুষ্টুমি কিংবা ডানপিটেপনা–কোনোটাতেই তার জুড়ি ছিল না কেউ।

তখন তার বছর দশেক বয়স। নবগোপাল মিত্রের আখড়ায় তখনই শরীরচর্চা করতে শুরু করে দিয়েছে বিলে। জিমন্যাস্টিক, লাঠিখেলা সব কিছুতেই হাত পাকিয়ে ফেলেছে সে।

ওরি মধ্যে একদিন নবগোপালবাবুর আখড়ায় এক প্রদর্শনী শুরু হয়। জিমন্যাস্টিক এবং অন্য সব কিছুর শেষে শুরু হয় লাঠি খেলা। দর্শকদের মধ্যে বসেছিল বিলেও। এই লাঠি খেলার সময় হঠাৎই আখড়ায় নেমে বলে, লাঠি খেলায় সে সবাইকে চ্যালেঞ্জ করছে। যে কারো সংগে সে লাঠি খেলতে তৈরি।

তার কথা শুনে সবাই যেমন তাজ্জব তেমনি বাহবাও দিতে থাকেন। ভিন পাড়ার লাঠি-খেলিয়েরা কিন্তু এতে চটে যায়। তাই ওদের সবচেয়ে তাগড়াই সেরা লাঠিয়ালটিকেই এগিয়ে দিল তারা। শুরু হলো খেলা। বিলে টুক টাক টুক টাক করে প্রতিপক্ষের মার ঠেকাতে থাকে। তারপর একসময় অদ্ভুত কৌশলে প্রতিপক্ষের লাঠিতে এমন একটা বাড়ি মারল যে লাঠি ভেঙে দু'খানা। ভাঙা লাঠি নিয়ে ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে রইল প্রতিপক্ষ, আর সবাই বিলের জয়ধ্বনিতে ভরিয়ে দিল বাতাস।

এমনি বেপরোয়া ছিল বিলে। আরেকটা ঘটনার কথা বলি। পাড়াতেই ছিল একটা চাঁপা গাছ। সেই গাছেই দোল খেত বিলে আর তার বন্ধুরা। তাদের চিৎকারে সরগরম হয়ে উঠত পাড়া। পাড়ার এক বৃদ্ধ রামরতন বসু তাদের চিৎকারে বিরক্ত হয়ে, আবার ছেলেরা পড়ে গিয়ে কি একটা কেলেঙ্কারি বাধে এই ভয়ে তাদের ডেকে বলেন, ওই গাছে উঠো না।

ছেলেরা জিজ্ঞেস করে, কেন?

ওগাছে ভূত আছে, ব্রেহ্মদত্যি। বলেই চলে যান তিনি।

ভূতের নাম শুনে ভয় পেয়ে যায় ছেলেরা। তারা ফিরে যেতে চায়। কিন্তু বিলে তাদের বলে, বুড়ো বললে ব্রেহ্মদত্যি আছে আর অমনি তোরা ভয় পেলি। দেখ আবার আমি চড়ছি, দেখি কোথায় আছে ব্রেহ্মদত্যি। আমি তার গায়ে থুতু দিয়ে দেখব।

সংগীরা বলে, না ভাই এমন করিসনি। সত্যি যদি ভূতে ঘাড় মটকায়।

বিলে হো হো করে হেসে বলে, ওরে তোরাও যেমন গাধা। একজন একটা কথা বলল অমনি বিশ্বাস করবি, যদি ওই ঠাকুরদা বুড়োর কথা সত্যি হতো তাহলে অনেক আগেই ব্রেহ্মদত্যি আমাদের ঘাড় মটকাতো।

এই হলো বিলে। কোনো সময়েই কোনো অবস্থাতেই অন্যের কথায় সে নাচত না। সাহস আর বিশ্বাস নিয়ে এগিয়ে যেত সব কিছুর মোকাবিলাতে।

সেই বছর দশ বারো বয়সেই থিয়েটার দেখতে গিয়ে প্রায় অমন একটি ঘটনাই ঘটেছিল। পাবলিক স্টেজে সেদিন যে নাটক অভিনয় হচ্ছিল তার এক অভিনেতাকে গ্রেপ্তার করার জন্য কোর্ট থেকে এক পেয়াদা এল। সেইসময় তাকে ধরে নিয়ে গেলে নাটকটাই পন্ড হয়ে যাবে।

হল ভর্তি লোক কিন্তু কেউ একটা কথাও বলছে না দেখে বিলে লাফিয়ে স্টেজে উঠে পেয়াদাকে বলে–যাও–যাও স্টেজের বাইরে। নাটক শেষ হোক–তারপর তোমার যা করার তাই কোরো। এখন এতগুলো লোকের আনন্দে তুমি বাধা

দিতে পার না।

বিলের সেই কথায় হকচকিয়ে পেয়াদা স্টেজ ছেড়ে চলে যায়। এতক্ষণে দর্শকদের মুখে কথা ফোটে। তারা বলে, ঠিক করছে ভায়া। তুমি না থাকলে আজকে আমাদের নাটক দেখাটাই মাটি হয়ে যেত।

সারা জীবন ধরেই এমন ঠিক করেছে বিলে। বন্ধুদের নিয়ে বেড়াতে বেরিয়েছে। হঠাৎ একটা ঘোড়ার গাড়ি বিলের এক বন্ধুর প্রায় ঘাড়ে এসে পড়ে। রাস্তার দুপাশ থেকে সবাই চেঁচায়, কিন্তু এগিয়ে আসে না কেউ ছেলেটিকে বাঁচাতে।

বিলে তখন রয়েছে একটু এগিয়ে। সবার চিৎকার শুনে ঘুরে দেখে ব্যাপারটা। তারপর ছুটে এক ধাক্কায় প্রায় ঘোড়ার গাড়ির চাকার তলা থেকে সরিয়ে আনে ছেলেটিকে। বিলের সাহস দেখে সবাই ধন্য ধন্য করতে থাকে।

বাড়িতে মা ভুবনেশ্বরী দেবী যখন সব শুনলেন, তখন তিনি ছেলেকে কোলে টেনে চুমু খেয়ে বললেন, বাছা, এইতো চাই। এই তো মানুষের মতো কাজ। সবসময় মানুষ হবার চেষ্টা করবি।

মায়ের এই আশীর্বাদ–এই অনুপ্রেরণা বিলের জীবনে দেখা দিয়েছিল সূর্যের মতো সত্যি হয়ে। মানুষের মতো মানুষ হয়ে অসংখ্য মানুষকে মানুষ হবার পথ দেখালেন বিলে। অবশ্য তখন তাঁর নাম স্বামী বিবেকানন্দ। সন্ন্যাসজীবনের শুরুতে যিনি ছিলেন স্বামী বিবিদিষানন্দ, সচ্চিদানন্দ ছদ্মনামের বেনাম ছেড়ে মানুষকে অমৃতমুখী করে বিবেকানন্দ নামে ইতিহাসের নীল আকাশে দেদীপ্যমান উজ্জ্বল এই জ্যোতিষ্কের আবির্ভাব ১৮৬৩ সালের ১২ জানুয়ারি।

অমৃতের সন্ধানী তিনি।

অমৃতজীবনে তাঁর অধিকার। সেই জীবনের ছোঁয়ায় বিশ্বকে দিয়েছেন তিনি মহৎ জীবনের উত্তরাধিকার।

জ্যাক লন্ডনের
হোয়াইট ফ্যাং
এডগার ওয়ালেসের
ট্রেইটরর্স গেট
জেমস ফেনিমোর কুপারের
দি লাস্ট অব দি মহিক্যানস
দ্য পাথ ফাইন্ডার
র‍্যাফেল স্যাবাটিনির
এ্যাক্রস দ্য পীরেনিজ
আর. এম. ব্যালেন্টাইনের
দ্য ক্যোরাল আইল্যান্ড

অনুবাদ সিরিজ

আর্নেস্ট মিলার হেমিংওয়ের
ফিফথ কলাম
সোমারসেট মমের
অব হিউম্যান বন্ডেজ
জন গলসওয়ার্দির
দ্য হোয়াইট মাংকি
এডগার ওয়ালেসের
দ্য ফোর জাস্ট মেন্
রিচার্ড হেনরী ডানার
ট্যু ইয়ার্স বিফোর দ্য মাস্ট
জেন লেনের
ফোর্ট্রেস ইন দ্য ফোর্থ

দেব সাহিত্য কুটীর (প্রাঃ) লিঃ
২১, ঝামাপুকুর লেন, কলকাতা–৯

ম্যাকিসম গোর্কির
মাদার
উইলিয়াম ফক্‌নারের
সোলজার্স পে
এরিক মারিয়া রেমামের
দ্য ব্ল্যাক অবলিস্ক
উইলিয়াম হ্যারিসন এইস ওয়ার্থের
উইন্ডসর ক্যাসল
ইউজিন স্যুরের
এ্যাডভেঞ্চারস অব মার্কো পোলো
মিস্টেরীজ অব প্যারি

রূপোর নদী

অনিল ভৌমিক

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

ভাইকিংরা ফ্রান্সিসদের নৌকোটা ওদের একটা নৌকোর সঙ্গে বাঁধল। তারপর দ্রুত চলল জাহাজের দিকে।

ফ্রান্সিসরা যখন জাহাজের ডেক-এ উঠল তখন বন্ধুদের মধ্যে আনন্দের বান ডাকল যেন। ফ্রান্সিস বিস্কো অক্ষত দেহেই ফেরেনি শুধু মোকাকেও মুক্ত করে এনেছে।

মোকাকে ধরাধরি করে কেবিন ঘরে শুইয়ে দেওয়া হলো। জাহাজের বৈদ্য কাঁচের বোয়ামে ওষুধপত্র নিয়ে এল। মোকার ক্ষত পরীক্ষা করে ওষুধ দিল। মোকা ঘুমিয়ে পড়ল।

এবার শুরু হলো ফ্রান্সিসের রূপোর নদী খোঁজা। অনেকে অনেক চেষ্টা করেছে কিন্তু রূপোর নদীর হদিস পায়নি। সেই নদী খুঁজে বের করতে হবে।

কঙ্কাল দ্বীপে ফ্রান্সিস আর হ্যারি ইকাবোদের দেওয়া একটা ঘরে আস্তানা নিয়েছে। প্রায় সারাদিনই ওরা দ্বীপটায় ঘুরে বেড়ায় যদি রূপোর নদীর কোনো হদিস মেলে। দ্বীপটা নেহাৎ ছোট নয়। কাজেই চার-পাঁচ দিন লেগে গেল সমস্ত দ্বীপটা ঘুরে ফিরে দেখতে।

বসতি এলাকায় ওরা যখন ঘুরে বেড়ায় ইকাবোরা মাথা নুইয়ে ওদের শ্রদ্ধা জানায়। ফ্রান্সিস আর হ্যারি ইকাবোদের বাচ্চা ছেলেমেয়েকে কোলে নিয়ে আদর করে। ইকাবোরা খুব খুশী হয়।

সেদিন ফ্রান্সিস হ্যারিকে বলল—'চলো গিয়ানির মন্দিরটা দেখে আসি। ওটা ভালো করে দেখা হয়নি।' দুজনেই বেরোল মন্দিরটার উদ্দেশ্যে।

কঙ্কাল পাহাড়ের মাথার নীচেই দক্ষিণ দিকে সেই মন্দিরটা। এদিকটায় ইকাবোদের বসতি কম। ওরা ঘুরে ঘুরে মন্দিরটা দেখতে লাগল। মন্দিরটা চারকোণা। গাছের ডাল, তাসক ঘাস আর নারকেল পাতা দিয়ে বোনা ছাউনি মন্দিরের চারটে চৌকোণো থাম রূপোর।

তাছাড়া মন্দিরের সামনে অর্ধগোলাকারভাবে সাজানো ছটা রূপোর থাম। হাত দিয়ে দেখল, বেশ মোটা নিরেট রূপোয় তৈরী থামগুলো। তাতে লতাপাতা আঁকা নানা কারুকাজ। ওখানে দাঁড়িয়ে ফ্রান্সিস মুখ উঁচু করে পেছনে তাকাল। দেখল কঙ্কালের মাথার পেছনটা। এবার দক্ষিণমুখো তাকাল। দেখল বাঁ দিকে একটা নদী বয়ে চলেছে। জলের রঙ হলুদ। ফ্রান্সিসের মনে পড়ল বন্দীদশা থেকে পালানোর সেই ঘটনা। সেদিন ওরাই পাথরের পাতলা আস্তরণ ভেঙে এই নদীটাকে মুক্তি দিয়েছিল। নদীটা সেই গুহা থেকেই বেরিয়েছে।

ডানদিকে শুধু বনজঙ্গল। বনজঙ্গল খুব ঘন নয়। ছাড়া ছাড়া।

মন্দিরের ভেতরে আধো অন্ধকারে দেখল কাঠে খোদাই করা গিয়ানি দেবতার মূর্তি। অনেক ইকাবো এসেছে বুনো ফুল ফল নিয়ে গিয়ানির পুজো দিতে।

ফ্রান্সিস আর হ্যারি কিছুক্ষণ ঘুরে ঘুরে দেখল। তারপর নিজেদের আস্তানায় ফিরে এল।

সন্ধ্যেবেলা বিস্কো এল। বলল—'ফ্রান্সিস, একবার

জাহাজে এস।'

'কেন? কী হলো?'

'বন্ধুদের মধ্যে অসন্তোষ দেখা দিয়েছে।'

'হুঁ।'

'ওরা আর এখানে থাকতে চাইছে না। অনেকদিন হয়ে গেল—দেশে ফিরে যেতে চাইছে।'

'রাত্রে আমি জাহাজে যাবো। সবাইকে ডেক-এ থাকতে বলবে।'

'বেশ।' বিস্কো চলে গেল।

ফ্রান্সিস আর হ্যারি চলল রাজবাড়ির উদ্দেশ্যে। পথে ইকাবোদের সঙ্গে দেখা হলে তারা মাথা নুইয়ে ফ্রান্সিস আর হ্যারিকে সম্মান জানাতে লাগল।

রাজবাড়ির ভেতরের ঘরে ঢুকে ওরা দেখল মোকা প্রদীপের আলোয় কী করছে। ওরা কাছে যেতে মোকা হেসে বলল—'আসুন।'

'পা কেমন আছে?'

'ভাল।' মোকা বলল।

ওরা দেখল মোকা ওর গায়ের কোহালহোর মতো একটা কাপড়ে কী আঁকছিল। গাছের ডাল থেঁতো করে তুলির মতো বানিয়েছে। ওরা যে পাথর গুঁড়ো করে রঙ বানায় শরীরে মুখে উল্কি আঁকার জন্য, তেমনি রঙ একটা চ্যাপ্টা পাথরে রাখা। হ্যারি জিজ্ঞেস করল—'ছবি আঁকছো?'

'হ্যাঁ, বলতে পারেন ছবিই। জানেন তো আমাদের মুখের ভাষা আছে—কিন্তু আপনাদের মতো কোনো অক্ষর নেই। আপনাদের জাহাজে থাকার সময় কিছু চামড়ার বই আমি দেখেছি। তখনই ভেবেছি আমাদের ভাষার লিখিত অক্ষর তৈরী করবো। সেইসব অক্ষর তৈরী করছি।'

হ্যারি আর ফ্রান্সিস কথাটা শুনে খুব খুশী হলো। হ্যারি মোকার কাঁধেই চাপড় দিয়ে বলল—'এই তো কাজের মতো কাজ। আমি আসবো। এই ব্যাপারে তোমাকে সাহায্য করবো।'

'তাহলে তো খুবই ভালো হয়।' মোকা হেসে বলল।

হ্যারি বলল—'অক্ষরগুলো তৈরী করতে খুব কল্পনার আশ্রয় নিও না। তোমরা মুখে গায়ে যে উল্কি আঁকো সেই রূপগুলো

মোকা হেসে বলল- 'আসুন।'

* পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদ কর্তৃক অনুমোদিত মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের পাঠ্যপুস্তক তালিকা—১৯৮৭ *

ষষ্ঠ শ্রেণী

বাংলা সাহিত্য—

১। সোনালী পাঠ (১ম —বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ঘোষ
২। সাহিত্য দীপিকা (১ম)—মধুসূদন দেব

বাংলা দ্রুত পঠন—

দুন্দুভি—অধ্যাপক অম্বরীষ রাহা

বাংলা ব্যাকরণ—

অভিনব বাংলা ব্যাকরণ—অধ্যাপক অম্বরীষ রাহা

ইতিহাস—

সমাজ ও সভ্যতা—শ্রীমতী আরতি চট্টোপাধ্যায় ও অধ্যাপক অমরনাথ ঘোষ

ভূগোল—

১। ভূগোল পরিচয় (১ম ভাগ)—অধ্যক্ষ চিত্তপ্রিয় রায়
২। সরল ভূগোল (১ম ভাগ)
—কে চট্টোপাধ্যায় ও এস. ভট্টাচার্য

Eng. Gram.—

Steps to Good English, Book I
Prof. N. C. Mukherjee

ভূচিত্রাবলী—

নূতন পৃথিবীর মানচিত্র
—দেব সাহিত্য কুটীর

প্রশ্নোত্তর—

ছাত্র সুহৃদ্ (২য় ভাগ)—মধুসূদন দেব

সপ্তম শ্রেণী

বাংলা সাহিত্য—

সপ্তস্বরা—অধ্যাপক অম্বরীষ রাহা

বাংলা উপপাঠ্য—চতুরঙ্গ—(ঐ)

বাংলা ব্যাকরণ ও রচনা—

ব্যাকরণ ও রচনা রত্নাবলী (৭ম ও ৮ম)
—অধ্যাপক অম্বরীষ রাহা

Eng. Gram.—

Steps to Good English, Book II
—Prof. N. C. Mukherjee

সংস্কৃত—

১। সংস্কৃত সোপানম (১ম)—ক্ষীরোদ চক্রবর্তী
২। সংস্কৃত ব্যাকরণের উপক্রমণিকা (৭ম ও ৮ম)
—ক্ষীরোদ চক্রবর্তী

ইতিহাস—

১। সভ্যতার রূপান্তর—সমরেশ ঘোষ
২। দেশ বিদেশের ইতিহাস (মধ্যযুগ)
—গোপাল বন্দ্যোপাধ্যায়

ভৌত-বিজ্ঞান

বিজ্ঞান বিকাশ (১ম)—ডঃ দীনবন্ধু চট্টোপাধ্যায়

ভূগোল—

ভূগোল পরিচয় (২য়)—অধ্যক্ষ চিত্তপ্রিয় রায়

অষ্টম শ্রেণী

বাংলা সাহিত্য—

কলতান—অধ্যাপক অম্বরীষ রাহা

বাংলা উপপাঠ্য—বিচিত্রা—ঐ

ভৌত-বিজ্ঞান—

বিজ্ঞান বিকাশ (২য়)—ডঃ দীনবন্ধু চট্টোপাধ্যায়

ইতিহাস—

১। স্বদেশ ও বিশ্ব—অধ্যাপক সমরেশ ঘোষ
২। দেশ বিদেশের ইতিহাস (আধুনিক যুগ)
—গোপাল বন্দ্যোপাধ্যায়

ভূগোল—

১। ভূগোল পরিচয় (৩য় ভাগ)—অধ্যক্ষ চিত্তপ্রিয় রায়
২। সরল ভূগোল (৩য়)—মুখার্জী ও ভট্টাচার্য

Eng. Gram.—

Steps to Good English Book III
—Prof. N. C. Mukherjee

সংস্কৃত—সংস্কৃত সোপানম (২য়)—ক্ষীরোদ চক্রবর্তী

নবম শ্রেণী

বাংলা ব্যাকরণ—

নব প্রবেশিকা ব্যাকরণ ও রচনা (নবম ও দশম)
—ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য

Eng. Gram.—

Steps to Good English. Book IV (IX-X)
—Prof. N. C. Mukherjee

Work Education—কর্মশিক্ষার রূপকর্ম (IX-X)
—অধ্যক্ষ পিযূষকান্তি চট্টোপাধ্যায়
কর্মশিক্ষার রূপকর্ম (২য়)—অধ্যক্ষ পীযূষকান্তি চট্টোপাধ্যায়

দেব সাহিত্য কুটীর প্রাইভেট লিমিটেড, ২১, ঝামাপুকুর লেন, কলিকাতা-৭০০০০৯

একটা দুটো করে পাথরে পা রেখে রেখে ওপরে উঠতে লাগল ফ্রান্সিস।

দিয়ে অক্ষর তৈরী করো। ইকাবোদের কাছে সেসব সহজবোধ্য হবে। পরিচিত উল্কির রূপ দেখে ওরা তাড়াতাড়ি অক্ষর চিনতে পারবে।'

'ভালো কথা বলেছেন।' মোকা বলল–'আমি এদিকটা আগে ভাবিনি।'

মোকা আর হ্যারি অক্ষর তৈরীর পরিকল্পনা নিয়ে কথা বলতে লাগল। ফ্রান্সিস চুপ করে কিছুক্ষণ ওদের কথা শুনল। তারপর একসময় বলল–'হ্যারি, এখন ওসব আলোচনা রাখো। মোকার সঙ্গে আমার জরুরী কথা আছে।'

'বেশ বলো।'

ফ্রান্সিস মোকাকে বলল–'দেখ মোকা, আমরা সারা কঙ্কাল দ্বীপ যথাসাধ্য ঘুরে ঘুরে দেখেছি। কিন্তু রূপোর নদীর কোনো হদিস করতে পারছি না।'

'অনেকেই চেষ্টা করেছে। বাবাও চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু কেউ খুঁজে বের করতে পারেনি।' মোকা বলল।

'আচ্ছা–রূপোর নদী সম্বন্ধে তোমার বাবা কী বলতেন? সত্যিই কি রূপোর নদী ছিল?'

'বাবা বিশ্বাস করতেন যে রূপোর নদী ছিল। বাবা আমাকে একদিন বলেছিলেন যে তিনি নাকি ঠাকুর্দার মুখেও শুনেছেন–রূপোর নদী বেরিয়েছে কঙ্কালের জটা থেকে।'

ফ্রান্সিস চমকে উঠলো। কঙ্কালের জটা মানে কঙ্কালের মাথার পেছন দিক। সেদিকে একটা নদী তো ওরাই গুহা থেকে বের করে দিয়েছিল। কিন্তু সে নদীর জল তো হলদেটে। সেটায় কি রূপোর গুঁড়ো আছে? দেখতে হয় তাহলে।

'আর কিছু বলতেন তোমার বাবা?'

'না। শুধু ঐ কথাটাই একদিন বলেছিলেন।'

'তোমার কী মনে হয়?'

'দেখুন ঐ নিয়ে আমি ভাবি না। রূপো তো খাদ্য নয় যে ইকাবোরা খাবে। উত্তরের বন অনেকখানি পুড়ে গেছে। জন্তু-জানোয়ার, পাখি মারা গেছে। কিছুদিনের মধ্যে আমার প্রজাদের খাদ্যাভাব দেখা দেবে। আমি ঐ নিয়েই ভাবছি এখন।'

কথাটা শুনে ফ্রান্সিস খুব খুশী হলো। একজন দায়িত্ববোধ-সম্পন্ন রাজার মতোই মোকার চিন্তা। ফ্রান্সিস বলল–'তোমাকে আর বিরক্ত করবো না। চলি।'

দুজনে ফিরে এল।

একটু রাত হতে ফ্রান্সিস আর হ্যারি নৌকো বেয়ে চলল জাহাজের দিকে। আজকে জ্যোৎস্না আরও উজ্জ্বল। সমুদ্রের

ঢেউয়ের মাথায় জ্যোৎস্না চিকচিক করছে। শান্ত হাওয়া বইছে।

ওরা যখন জাহাজের ডেক-এ উঠল—দেখল সব ভাইকিংরা উপস্থিত। বসে দাঁড়িয়ে সবাই ফ্রান্সিসের জন্যে অপেক্ষা করছে।

ফ্রান্সিস একবার সকলের দিকে তাকিয়ে নিয়ে উচ্চস্বরে বলতে লাগল—'ভাইসব—যাত্রা শুরু করবার আগেই আমি বলেছিলাম অনেক দুঃখকষ্ট সহ্য করবার জন্যে আমাদের তৈরী থাকতে হবে। আমরা এখানে চড়ুইভাতি করতে আসিনি। রূপোর নদী খুঁজে বের করবার সংকল্প নিয়ে এসেছি। অবশ্য কষ্ট, লড়াইয়ের দিন শেষ হয়েছে। এখন বুদ্ধির জোরে এগোতে হবে। তার জন্যে তোমাদের প্রয়োজন পড়বে হয়তো। কিন্তু সেটা পরে। এখন তো তোমাদের আনন্দেই দিন কাটছে। তবে অধৈর্য হয়ে উঠছো কেন?' ফ্রান্সিস থামল। কেউ কোনো কথা বলল না। ফ্রান্সিস আবার বলতে লাগল—'যা হোক বোধহয় তোমাদের বেশীদিন অপেক্ষা করতে হবে না। রূপোর নদীর হদিস পেতে আর দেরী নেই। কব্জির লড়াইয়ের দিন শেষ। এখন বুদ্ধির লড়াই চলছে। এ সময়ে তোমরা 'দেশে যাবো' 'বাড়ি যাবো' এসব বলে ঝামেলা বাড়িও না। এভাবে আমার মনের একাগ্রতা নষ্ট করো না। এটা আমার আদেশ নয়—অনুরোধ। ব্যস্—আর আমার কিছু বলবার নেই।' ফ্রান্সিস থামল। কেউ কোনো কথা বলল না।

হ্যারি বলল—'যদি কারো কিছু বলার থাকে বলো। পরে যেন বাড়ি ফেরার বায়না তুলে ঘোঁট পাকিও না।'

একজন ভাইকিং বলল—'ফ্রান্সিস, একটা কথা। তুমি কি বিশ্বাস করো রূপোর নদী বলে কিছু আছে?'

'অবশ্যই।' ফ্রান্সিস বলল—'যেমন তুমি আমার সামনে দাঁড়িয়ে কথা বলছো এটা সত্য, তেমনি রূপোর নদী আছে এটাও সত্য।'

'কবে নাগাদ এই রহস্য ভেদ করতে পারবে?' আর একজন ভাইকিং বলল।

'সেটা নির্ভর করছে রহস্যের সূত্রগুলোর ওপর। তবে যতদূর মনে হয় সপ্তাহখানেকের মধ্যেই এই রহস্যের একটা সমাধানে পৌঁছোতে পারবো।'

আর কেউ কোনো কথা বলল না। সভা ভেঙে গেল।

পরদিন সকালে ফ্রান্সিস হ্যারিকে ডেকে বলল—'চলো আজকে কঙ্কাল পাহাড়টা ভালো করে দেখবো। ওটার মাথায় ওঠা যায় কিনা সে চেষ্টাও করবো। অবশ্য প্রথমে দেখবো হলুদ জলের নদীটা।'

দুজনে বেরোল। সকালের ঝকমকে রোদে-ছাওয়া পাহাড়ের ঢাল বেয়ে ওপারের দিকে চলল। হলুদ জলের নদীটার কাছে এল। ফ্রান্সিস নদীটা ভালো করে দেখতে লাগল। নদীর দুধারে হলুদ রঙের স্তর জমে গেছে। ও কোমরের ফেট্টি থেকে একটুকরো বড় ন্যাকড়া বের করল। নদীর জল একটা নারকেলের মালা দিয়ে তুলে ন্যাকড়ায় ছাঁকল। বেশ কয়েকবার। দেখা গেল ন্যাকড়াটায় হলুদ স্তর জমে গেছে। ফ্রান্সিস সেই স্তর আঙুল দিয়ে ঘেঁটে দেখে হতাশার ভঙ্গীতে ঘাড় নাড়ল। ও রূপোর গুঁড়ো আশা করেছিল। দেখল—তেমন কোনোকিছুর চিহ্নমাত্র নেই।

এবার দুজনে চলল কঙ্কাল পাহাড়ের দিকে। চড়াই বেয়ে উঠতে লাগল দুজনে। প্রকৃতির অদ্ভুত খেয়াল। পাহাড়টার মাথাটা নরকঙ্কালের মাথার মতো। চোখের একটা বড় গর্তও তাতে। আর একটা চোখের গর্ত আর্ধেকটা আছে। বাকীটা ভেঙে ধসে গেছে। হ্যারি সব দেখতে দেখতে বলল—'জানো, আমার কেমন সন্দেহ, এই মাথার পুরোটাই প্রকৃতির খেয়াল নয়। মোকাদের পূর্বপুরুষরা এই মাথার চোখ দুটো পাহাড় কুঁদে করেছে।'

ফ্রান্সিস ভালো করে দেখল চোখ দুটো। সত্যি সমান দূরত্বে দুটো গহ্বর। প্রকৃতির খেয়াল নাও হতে পারে।

ফ্রান্সিস মাথাটার দিকে তাকাল। তিন দিকই ঢালু। ওঠার উপায় নেই। একমাত্র যে চোখের গর্তটা ধসে গেছে সেখান দিয়েই ওঠা যেতে পারে। সেদিকে পরপর ভাঙা পাথর ছড়ানো। বোধহয় ভূমিকম্পেই এটা হয়েছে।

ফ্রান্সিস পশ্চিম দিকের ঐ ধসা জায়গাটায় এল। ভালো করে ছড়ানো পাথরগুলো দেখল। একটা দুটো করে পাথরে পা রেখে ও ওপরে উঠতে লাগল। চোখের গর্ত ছাড়িয়ে কপালের কাছে উঠে এল। আর ওঠার উপায় নেই। ও লক্ষ্য করল কয়েকটা খোঁদল রয়েছে মাথার দিকে। সেগুলোতে পা রেখে রেখে একসময় ফ্রান্সিস বুক দিয়ে ঘষটে ঘষটে পাহাড়ের মাথায় পৌঁছল। পরিষ্কার সব দেখা যাচ্ছে। উত্তর দিকে ইকাবোদের বসতি, কুনহা নদী বনজঙ্গল সমুদ্র। দূরে ওদের জাহাজ।

এবার বুক চেপে আস্তে আস্তে দক্ষিণমুখো হলো। ঠিক নীচেই গিয়ানির মন্দির। ছ'টা রূপোর থাম। বাঁদিকে হলুদ জলের নদী বয়ে যাচ্ছে। বনজঙ্গল। তারপরেই সমুদ্র।

হঠাৎ এই দৃশ্যটা ওকে নাড়া দিল। ও চমকে ভালো করে তাকাল। ঠিক এমনি একটা ছবি ও কোথায় দেখেছে। বাঁদিকের হলুদ নদী। সবুজ গাছের নক্সা। সারি সারি। ডানদিকে কী যেন একটা? হ্যাঁ—সাদা রঙের নদী। কিন্তু এখানে সেটা নেই। কোথায় দেখেছি—এমনি নক্সা ছবি? কোথায়? হ্যাঁ হ্যাঁ—মোকা রাজার গায়ের কাপড়টা—কোহালহো—জাহাজে রোদ্দুরে শুকোচ্ছিল। ফ্রান্সিস চীৎকার করে উঠল—কোহালহো।

হ্যারি নীচ থেকে বলল—'কী হয়েছে?'

ফ্রান্সিস চীৎকার করে বলল—'রূপোর নদীর রহস্য—ভেদ করেছি।'

[চলবে]

ছবিঃ নারায়ণ দেবনাথ

নেপালচন্দ্র ভট্টাচার্য স্মৃতি সাহিত্য প্রতিযোগিতার প্রথম পুরস্কারপ্রাপ্ত গল্প।

শ্রদ্ধা

দীপায়ন বিশ্বাস

ঘরে ঢুকতে গিয়েও থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে সুমন। ঢুকতে পারে না...মা আর বাবার মধ্যে কিছু আলোচনা চলছে। এ সময় ঘরে ঢোকা মানেই আলোচনার তালটা কেটে দেওয়া। সেটা ও চায় না। একটু পরে ঢুকবে ভেবে সরে যাচ্ছিল কিন্তু কটা কথা কানে যেতেই অনিচ্ছা সত্ত্বেও একটু দাঁড়াতে হয়। বাবা বলছেন—সবই হলো, কিন্তু যাবার আগে শুধু একটাই দুঃখ রয়ে গেল...

—আবার সেই যাবার আগে যাবার আগে শুরু করলে, তা হলে, তুমি ঐ করো আমি চল্লাম। রান্নাঘরে কাজ আছে।

—তুমি বিরক্ত হচ্ছো, কিন্তু এই অসুস্থ শরীরটা আর বইতে ইচ্ছা করে না। সবারই কষ্ট। আসলে কী জান, অনেক দিনের একটা ইচ্ছা ছিল তোমাকে নিয়ে একটু তীর্থে বেরুবো; কাশীটা দেখবো। লছমনঝোলা—হরিদ্বারে যাবো। কিন্তু যাবো যাবো করেও হয়ে ওঠেনি, সংসার নিয়েই ব্যস্ত রইলাম। তারপর

যখন সংসারের ঝামেলা থেকে মুক্তি পেলাম, চাকরি থেকেও অবসর পেলাম তখন ইচ্ছাটা রইল শরীরটা গেল। একদিকে হাঁপানি নিল শরীরটা আর বাত নিল হাঁটাচলার শক্তিটুকু।

—নাইবা হলো কাশী হরিদ্বার যাওয়া। এ জন্য মন খারাপ করো না তো। অনিমা দেবী সান্ত্বনা দেন স্বামীকে। দুটো মেয়েকেই তুমি ভালো ঘরে বিয়ে দিয়েছো। সুখেই আছে ওরা। আর তোমার ছেলের মতো ছেলে আজকের দিনে কটা ঘরে আছে বলো তো? যেমন লেখাপড়ায়, ব্যবহারে, চাকরিটাও ঠাকুরের আশীর্বাদে কতো ভালো হয়েছে। আর সব থেকে বড় কথা মুখের উপর একটা কথা বলেনি আজ পর্যন্ত এত বড়টা হলো। এখন আমাদের একটা কাজই বাকি রইল ওর বিয়েটা দেওয়া।

সুমন আর দাঁড়ায়নি। এ পর্যন্ত শুনেই চলে গেছিল সেখান থেকে।

সপ্তাহ দুয়েক পর আস্তে আস্তে বাবার ঘরে ঢোকে সুমন। বাবার সামনে গিয়ে দাঁড়ায়...।

—কিরে কিছু বলবি? অবিনাশবাবু জিজ্ঞাসা করেন।

—আপনার শরীরটা এখন কেমন আছে?

—ভালই। ওষুধপত্তর তো গাদাখানেক এনে রেখেছিস। ডাক্তারও প্রায় বাঁধা। কী বলবি বলছিলি?

—না...মানে একটা অন্যায় করে ফেলেছি। আপনাকে জিজ্ঞেস না করে কাজটা করা হয়তো ঠিক হয়নি।

—কী কাজ রে...? জিজ্ঞাসু চোখে ছেলের দিকে তাকাল অবিনাশবাবু।

একটু চুপ করে থাকে সুমন, তারপর বলে—অফিস থেকে হঠাৎ কিছু টাকা পেয়ে গেলাম, তাই ভাবলাম তিনজনে মিলে একটু বেড়িয়ে আসবো। আমি, আপনি আর মা। তিনটে টিকিটও কেটে ফেলেছি। প্রথমে কাশী যাবো, তারপর হরিদ্বার, লছমনঝোলা, হৃষীকেশ। কষ্ট হয়তো হবে না, ফার্স্ট ক্লাসের টিকিটই নিয়েছি।

—ওগো শুনছো, কোথায় গেলে। একবার তাড়াতাড়ি এদিকে শুনে যাও তো।

—কী হলো? এখন আমার শোনার মতো সময় আছে যে ডাকাডাকি শুরু করলে। খোকার অফিসের ভাত দিতে হবে না। বলে হাত মুছতে মুছতে অনিমা দেবী ঘরে এসে ঢোকেন।

—এই দ্যাখ, তোমার ছেলে কী কান্ড করেছে। উৎসাহে আনন্দের চোটে উঠে বসেন অবিনাশবাবু। হঠাৎ যেন সেরে গেছে রোগটা। এক গাদা টাকা খরচ করে তিনটে টিকিট নিয়ে এসেছে...ফার্স্ট ক্লাসের। তুমি, আমি আর খোকা যাবো। কাশী...লছমনঝোলা, হরিদ্বার, হৃষীকেশ। অনিমা দেবী কোনো কথা বলতে পারেন না। আনন্দে আবেগে তাঁর চোখের কোণটা ভিজে ওঠে। অস্ফুটে শুধু একটা শব্দই বেরিয়ে আসে ওঁর গলা দিয়ে...খোকা...!!

—০০০—

ছবি : রাহুল মজুমদার

নেপালচন্দ্র ভট্টাচার্য স্মৃতি সাহিত্য প্রতিযোগিতার
দ্বিতীয় পুরস্কারপ্রাপ্ত গল্প

পিতৃভক্তি

বেবী চৌধুরী

যা ভাগ, ভাগ এখান থেকে। বাইরে থেকে বিশুর গলা ভেসে এলো। এখানে যারা রক্ত বেচতে আসে সবার ওপরই ওর একটু খবরদারি করা চাই। এটা বিশুর স্বভাব।

বিশু এখানকার পিওন।

ডাঃ অতনু রায় সবে বাঁকুড়া মেডিকেল কলেজ থেকে এখানে ব্লাড ব্যাঙ্কে বদলি হয়ে এসেছে। বিশুর চিৎকারে একবার দরজা খুলে অপেক্ষমান লোকদের দেখার চেষ্টা করলো। আর সঙ্গে সঙ্গে বিশুর সঙ্গে বচসারত একটা ছেলেকে দেখতে পেয়ে সেদিকে এগিয়ে গেল।

বিশু হাঁফ ছেড়ে বাঁচলো। বলল, দেখুন নতুন ডাক্তারদা, এতটুকু বাচ্চার কি সাহস, বলে কিনা আমি রক্ত বেচতে চাই। কত টাকা তোমরা আমাকে দেবে। ব্যাটার গায়ে ক'ফোঁটা রক্ত আছে দেখুন তো।

অতনু ছেলেটাকে ভাল করে লক্ষ্য করলো। কতো আর বয়স হবে। বড়ো জোর দশ কি এগারো। মুখ থেকে এখনও দুধের গন্ধই যায়নি। অথচ এখানে এসেছে....। আবার বলে, আমি কি ভিখিরি যে আমাকে ওভাবে তাড়িয়ে দিচ্ছো।

বিশু ছেলেটার দিকে চোখ পাকিয়ে অতনুকে উদ্দেশ করে বলল, নিশ্চয়ই ছেলেটা এ বয়সে বখে গেছে। তা নাহলে ওর কিসের টাকার এতো প্রয়োজন।

অতনু এবার ছেলেটার দিকে এগিয়ে গিয়ে বলল, তোমার তো এখনও রক্ত দেওয়ার মতো বয়স হয়নি খোকা। সময় হলে আমরা তোমাকে পরীক্ষা করে রক্ত নেব। এখন এখানে ঝগড়া না করে বাড়ি যাও।

আমার এ কথায় ছেলেটা কান্নায় ভেঙে পড়ল। তাহলে আমি টাকা কোথা থেকে পাবো ডাক্তারবাবু। আমার যে টাকার বড়ই প্রয়োজন। আমার বাবার ভীষণ অসুখ। বিছানা থেকে উঠতেই পারছেন না। কাজেও যেতে পারছেন না। আত্মীয়স্বজন মাঝে একদিন এসেছিলেন। ডাক্তার ডেকেছিলেন। তারপর সব কেমন থেমে গেছে। কাল থেকে বাবা ভুল বকছে। ডাক্তার ডাকবো তারও পয়সা নেই।

এটুকু বাচ্চা হলে কি হবে, কী সুন্দর বানিয়ে একটা আষাঢ়ে গল্প বললে। ভাল অভিনয় করতে শিখেছে।–বিশু বাচ্চাটাকে আবার ধমক দিল।

অতনু বিশুকে থামিয়ে দিয়ে বলল, ঠিক আছে তুমি এখানে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করো, আমি তোমার বাবাকে দেখে আসবো।

খড়ের ছাউনি দেওয়া এক চিলতে মাটির ঘর। ঘরের এক কোণে দুটো জানলার শিকের সঙ্গে দড়ি টাঙানো। তাতে কয়েকটা পুরনো জামাকাপড়, প্যান্ট ঝুলছে। আর এক কোণে একটা ভাঙা তক্তপোসে শুয়ে আছে ওর বাবা।

ছেলেটা একটা টুল বের করে অতনুকে এগিয়ে দিল।

অতনু অতি সন্তর্পণে টুলটার ওপর বসল। ইতিমধ্যে ছেলেটার মাও সামনে এসে দাঁড়িয়েছে।

অতনু পরীক্ষা করে দেখলো। নিউমোনিয়া। এখনই হাসপাতালে ভর্তি করা দরকার।

ছেলেটার মা কাঁদতে কাঁদতে বলল, ডাক্তারবাবু আমাদের....।

অসমাপ্ত কথাটা টেনে নিয়ে অতনু বলল, কোনো ভয় নেই। আমিই সব ব্যবস্থা করে দিচ্ছি।

হাসপাতালে ফ্রী বেডে ভর্তি করে অতনু যখন নিচে নেমে এলো তখন দেখল, ছেলেটা ওর মার সঙ্গে একটা বেঞ্চে বসে আছে। ওকে দেখে বিস্ময়ভরা দৃষ্টি মেলে দু'জনে তাকালো।

অতনু ছেলেটার মার হাতে দশটা টাকা দিয়ে বলল, এটা রেখে দিন। পরে কাজে লাগবে। আর তুমি কখনও মাকে না জানিয়ে রক্ত বেচবে না। ছেলেটাকে উদ্দেশ্য করে বলল।

ছেলেটা বলল, না, আর কখনও যাবো না। বাবা কারো কাছে হাত পাততে বারণ করতেন। বলতেন, সেটা স্বভাব হয়ে যায়। নিজের অভাব নিজেকেই চেষ্টা করে মেটানোর ব্যবস্থা করতে হবে।

অতনু আর দাঁড়ালো না। বেরোনর সময় কেবল মনে হলো, দারিদ্র্য ছেলেটার সব কিছু কেড়ে নিলেও পিতৃভক্তি ওর মন থেকে এখনও কেউ কেড়ে নিতে পারেনি।

চব্বিশ পরগণা জেলার মধ্যমগ্রামের রবীন্দ্রপল্লী থেকে কালীপদ ও অপর্ণা বসু তাঁদের একমাত্র মেয়ে প্রণামী বসুর স্মৃতিরক্ষার জন্যে একটি সাহিত্য প্রতিযোগিতার আয়োজন করেছেন। তাঁদের প্রস্তাব মতো আমরা প্রণামী বসু স্মৃতি সাহিত্য প্রতিযোগিতার জন্যে পাঠক-পাঠিকাদের কাছ থেকে মৌলিক লেখা চাইছি।

জন্ম : ২৭ কার্তিক ১৩৫৯

মৃত্যু : শ্রাবণ ১৩৮৮

বিষয়বস্তু

গানে গানে ভরিয়ে দেবো ভুবন

লেখা পাঠাবার শেষ দিন ৩০ ফাল্গুন। পুরস্কারপ্রাপ্ত লেখা দুটি শুকতারার জ্যৈষ্ঠ সংখ্যায় ছাপা হবে।

প্রথম পুরস্কার : ৩০ টাকা :: দ্বিতীয় পুরস্কার : ২০ টাকা।

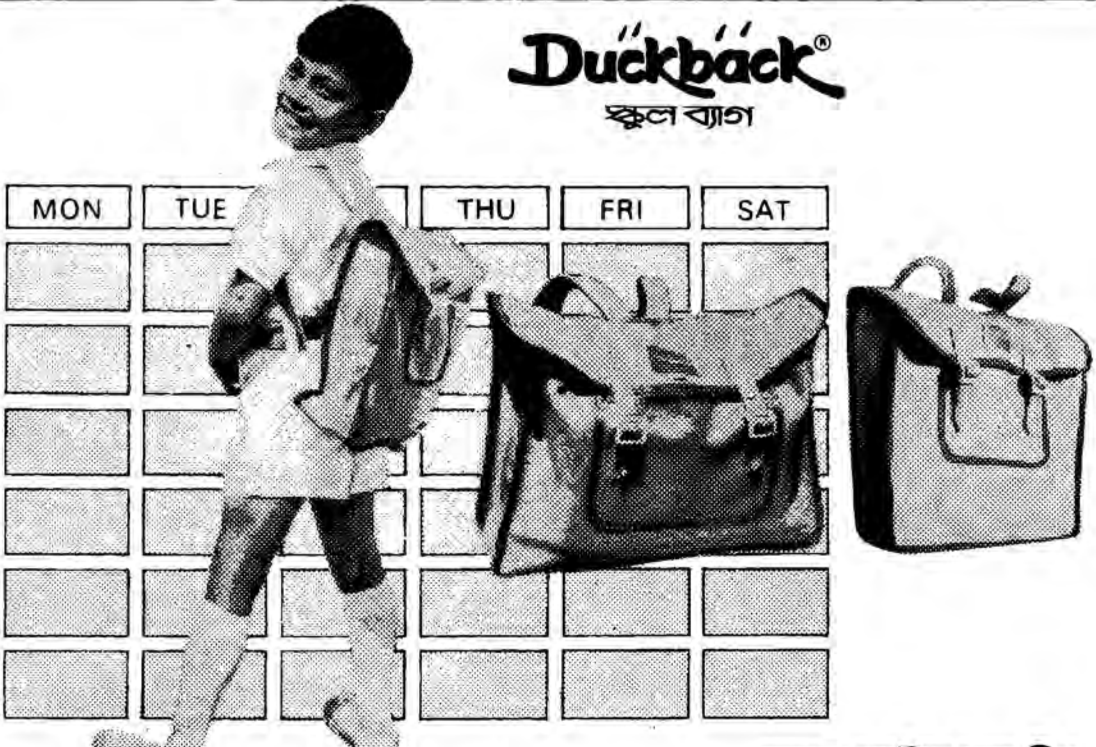

নতুন ধাঁধা

১. মাথা কাটলে বনে থাকে
পেট কাটলে গাছে
আর পা কাটলে মাঠে মাঠে
যায় সে এঁকে বেঁকে।

শ্রাবন্তী সিংহ রায়
সাহারসা/রেল কলোনী/বিহার

> অগ্রহায়ণ সংখ্যার ধাঁধার উত্তর
> ১. কিউল [বিহার] ২. সংগীন ৩. খাজানা ৪. কদর

৩. মুখখানা ঘোড়া তার
দেহখানা মানুষের
সুরলোকে গায় গান
নাম কিবা তাহাদের।

উদয় ভট্টাচার্য
আপার বাবুপট্টি/লামডিং/আসাম

২. মন্দ দিয়ে শুরু তার
সত্য দুই পিছে,
সবটা মিলে খুঁজে বেড়াও মায়া জালের নিচে।

বিমল কুমার গোস্বামী
ইন্ডিয়ান ওভারসীজ ব্যাঙ্ক/রাণীগঞ্জ/বর্ধমান

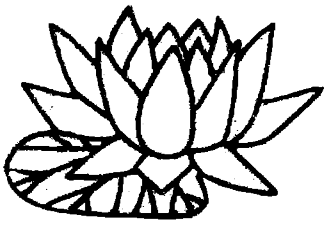

৪. সে নয় তো, কে?
যুদ্ধে চলেছে।

—গোপালকৃষ্ণ মন্ডল ও
চিত্রা মন্ডল
বহড়ু/২৪-পরগণা

নতুন শব্দমালা

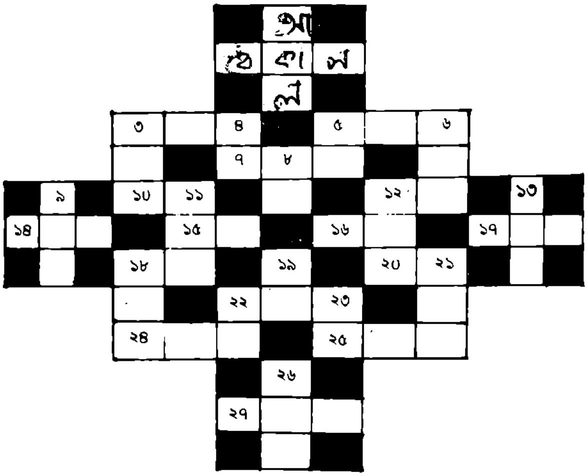

সূত্র

পাশাপাশি

২। পৃথিবীর গভীরতম হ্রদ
৩। এশিয়ার অন্যতম নদী
৫। ভাগ্য পরীক্ষার খেলা
৭। হিংসা
১০। বালক
১২। দৃষ্টিসীমা
১৪। শোবার কথা এখানে
১৫। ব্যাধটির শরে শ্রীকৃষ্ণের মহাপ্রয়াণ মহাভারতে
১৬। বাহুর অস্থিবিশেষ
১৭। ধার্মিক ব্যক্তি
১৮। পাশব
২০। মাছের নামে পাব 'কোথায়'?
২২। ভারতের প্রধান হ্রদ
২৪। পদক
২৫। 'দেহ' তব
২৭। কুঞ্জবন

ওপর-নিচ

১। 'দুর্ভিক্ষ' ভীষণ
৩। ধনী ব্যক্তি
৪। নাদ
৫। মদিরা
৬। সহিষ্ণুতা
৮। পক্ষী
৯। মিতা
১১। রাজপুত্র
১২। প্রেরণকারী
১৩। ব্রহ্মদেশের প্রধান রপ্তানী দ্রব্য
১৮। 'ভাগ্য' তব
১৯। 'পরামর্শ' বা তার পূর্বে বসে
২১। ঘনিষ্ঠ সংগী
২২। পার্বতী
২৩। মন্দির
২৬। উত্তর ভিয়েতনামের রাজধানী

তৈরি করেছেন
কিষেণজিৎ দে কে.জি.ভিলা (বাহাদুরপুর) করিমগঞ্জ/আসাম

শ্রাবণ সংখ্যার ধাঁধার সফল উত্তরদাতাদের নাম

।। কলকাতা ।।

প্রদীপালোক পাল/প্রিন্সেপ স্ট্রিট; রঞ্জন, প্রীতি, সমীর, অসিত ও স্মৃতি/তারা পার্ক; নির্মাল্য ও পিনাকী তপস্বী/ বরানগর; টুটু, মনা ও বাবু/দমদম পার্ক; দুষ্টু ও মিষ্টি/লী রোড; সৌমেন, মীনা, অসীম ও অর্ঘ্য পাল/প্রিয়নাথ চক্রবর্তী লেন; পাপু, মুন্নাই, শর্মি, রিম্কা, পমপম/আর্য সমিতি রোড, বেহালা; অমিতাভ, উৎপল, প্লাবনজিৎ, নিবেদিতা, পারমিতা ও অনিন্দিতা/দমদম ক্যান্টনমেন্ট; মলয়, মানস/বি.এল.ঘোষ রোড, নওদাপাড়া; বিশ্বরূপ, শান্ত, মহাশ্বেতা/রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর রোড; তনু, পাবু, টাবু, লাবু, রাজা, যীশু, রুমকি ও জয়/যাদবপুর; অর্ণব, অনিল, সংযুক্তা, বীণা/রাণীকুঠী; দীপু, মিঠু, বাবুল, নিবেদিতা, শ্বেতা ও শর্মিলা/হেদুয়া; সজল, শিল্পী ও সায়ন্তী মজুমদার/এন.জি.বসাক রোড, দমদম; অরুণিমা, অমৃতা ও কৌস্তুভ ঘোষ/শুঁড়া থার্ড লেন, বেলেঘাটা; পাপিয়া, বিশ্বজিৎ ও শর্মিলা/গোপালচন্দ্র লেন, কলুটোলা; মৈনাক, গার্গী, ছন্দা ও সুস্থির মিত্র/রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর রোড, বেদিয়াপাড়া; রাণু, রুমা ও সীমা/দমদম রোড; প্রমিত বসু/জয়নারায়ণ টি.পি.লেন; আলপনা, অপর্ণা ও সৌমিত্র/রায়পাড়া হাউজিং এস্টেট; সুখেন্দু, শ্রীলেখা, সুদক্ষিণা ও দক্ষিণী ভট্টাচার্য/সুরেন সরকার রোড; শুক্লা, কৃষ্ণা, পূর্ণিমা, অনামিকা ও উশ্রী/বেলঘরিয়া সি.পি. এস্টেট; সোহম সায়ন, দেবর্পিতা, শম্পা, সুভাষ, অশোক, সোনালি, জহর, সন্তোষ, কৃষ্ণা, শ্যামল, কাবেরী ও উমা/আহিরীটোলা; বাপি, রবি, ভিন্টু, রাজীব ও অমিত মাইতি/বন্ধুদল স্পোর্টিং ক্লাব, যাদবচন্দ্র ঘোষ লেন; গড, ফুচু ও পিংকি/টবিন রোড, বরাহনগর; ইরা, অরিজিৎ ও প্রতিমা/এস.এন.রায় রোড; ঝুমা, সুচরিতা, হাঁদু, শিল্পী ও লীনা-বুয়া/ভূপেন্দ্র বসু এভিনিউ; চৈতালী ঘোষ/উল্টাডিঙ্গি রোড, শ্যামবাজার; সুদীপ্ত নাগ/জপুর রোড; পার্থ, অজয়, ধীপু, স্বপন ও হাপুর/সিল্ক হোম, মহাত্মা গান্ধী রোড; অমিতাভ, প্রদীপ, দেবযানী ও অপরাজিতা/দীননাথ মিত্র লেন; সমর, সন্দীপ, সোমা ও মণিদীপা/নিউ সি.আই.টি. বিল্ডিং, বেলেঘাটা; শকুন্তলা মিত্র/হরেকৃষ্ণ শেঠ লেন;

।। হাওড়া ।।

মৌমিতা ও রুচিরা পাল/শান্তিরাম রাস্তা, বালি; কাকলি কর/রামকৃষ্ণপুর লেন, শিবপুর; বিবু, ডাবু, নিবু, জীতেন/ চ্যাটার্জীহাট, শিবপুর; প্রদীপ, কাবেরী ও কৃষ্ণা বসু/মধুসূদন বিশ্বাস লেন; আদিত্য, মালতি ও আশিস কোনার/যদু মুখার্জী লেন, বাজে শিবপুর; মন্টু ও অণিমা চক্রবর্তী/'এইচ' রোড, বেলগাছিয়া, হাওড়া; বাপী, মহুয়া, পাপড়ি, পারমিতা ও সৌরভ বসু/অবিনাশ ব্যানার্জী লেন, শিবপুর; ইন্দ্রনাথ, চন্দ্রনাথ, সীমা, অতনু, অদ্রিজা ও মৈনাক/ঠাকুর রামকৃষ্ণ লেন; রুমকি ঘোষ/নস্কর পাড়া লেন; সুশীল, মিঠু, পিংকি ও সৌম্যপ্রিয় দাস/উত্তর খুরুট; দেবরাজ, বাবু, বুলা/ন্যাশনাল গ্রেস, বাকসাড়া; অনিল, মুদি, সুব্রত, নিরাপদ, সুশান্ত, অমিতাভ ও কৃষ্ণেন্দু/রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যামন্দির, বেলুড়মঠ; শ্যামলী, রূপা, সুতপা, অরূপ, কাকলি, বিশ্বজিৎ ও তপজিৎ/মাকড়দহ; জয়ন্ত ব্যানার্জী/মাজু; শাশ্বতী, শান্তনু/সালকিয়া; শোভন, শুভ্র, অদিতি ও রাণু মান্না/আন্দুল পূর্ব পাড়া; মীরা, বিমান, রীতা, সব্যসাচী ও শতাব্দী মুখার্জী/গণেশ চ্যাটার্জী লেন, শিবপুর; রাজা, শুভ ও সৌম্যেন্দু ভট্টাচার্য/খাঁটোরা, বেগড়ি;

।। হুগলী ।।

শুভ্র, শাখী ও অনুশ্রী গঙ্গোপাধ্যায়/নিত্যানন্দপুর; তুষার ও মিতা/বৈঁচিগ্রাম; পিয়ালি ও কুহেলী চ্যাটার্জী/ভদ্রকালী, শিবতলা; মীরা, মণি, শুভ্রা, সজল, রিক্তা, তন্দ্রা ও অপূর্ব/বিবেকপল্লী, শেওড়াফুলী; পিক্লু, পাপাই ও অমর মুখার্জী/খামারগাছি; সুপ্রকাশ, সুপ্রসন্ন, সুপ্রবুদ্ধ, সুপ্রতিম, সুপ্রভাত, সুপ্রিয়, সুহিতা, সুমিতা, তরুণ, মিতুল ও পানু/কানাইপুর; স্বাতী ব্যানার্জী/জমিদার রোড, শেওড়াফুলি; লোপামুদ্রা, দেবযানী, সৈকত ও সুবীর নন্দন/জি.এন.মুখার্জী রোড, বাঁশবেড়িয়া; রাজা, মল্লিকা, শুভব্রত ও বিমল/ব্যানার্জীপাড়া, চন্দননগর; দেবাশিস ও স্নেহাশীষ চট্টোপাধ্যায়/শ্রীরামপুর; শ্যামাপ্রসাদ, সুপর্ণকান্তি, সুমি ও বিনি/কয়াপাট; সীমা বসু ও দীপা বসু/১১ নং রেল গেট, বৈদ্যবাটী; শেলী, সঞ্চিতা, করুণা, মানিক, ভোলা, গৌতম, রাজেন্দ্র, সৌখেন/গভঃ কলোনী, শেওড়াফুলী; জুলি, রিম্পি, টিটু, মুনাই, সমু ও কল্লু/রামকৃষ্ণ রোড, রিষড়া; কবিতা, টিঙ্কু, রুবি, রীণা, শুভঙ্কর, অপু, দীপু ও তুহিন/মাহেশ; আসিফ ইকবাল, মহঃ ইসমাইল ও বেগম হাসিনা আক্তারী/জি.টি. রোড, শেওড়াফুলি; জুবিলি ও বিশ্বদীপ ঘোষাল/শিবতলা লেন, মাহেশ; কৃষ্ণা, রিঙ্কু, টিংকু ও অনল মুখার্জী/চুঁচুড়া স্টেশন কোয়ার্টার্স; শুভম চট্টোপাধ্যায়/ধনেখালি; ঈশান, সুরঞ্জনা, সুনীতি ও অশোক মুখার্জী/ঢুলিপাড়া লেন, শ্রীরামপুর; শম্পা, সোমা/খামারপাড়া, গন্ধেশ্বরী ঘাট, বাঁশবেড়িয়া; মৌরি, মণিমালা ও অজয়/ডানলপ, সাহাগঞ্জ; বুজু, সুজু, বাবলু ও বাবু নন্দন/মাঝের সড়ক, বাঁশবেড়িয়া;

।। বীরভূম ।।

আর্যভট্ট খাঁ/কীর্ণাহার; তৃপ্তি, বাবু, আনন্দ ও পাপু/দক্ষিণগ্রাম; সাবির, সাগির, সুজা ও দুলহাভাই/সাঁইথিয়া, নেতাজীপল্লী; বোধিসত্ত্ব, সৌম্যসত্ত্ব, প্রজ্ঞাসত্ত্ব ও শুদ্ধসত্ত্ব মণ্ডল/কলেজ রোড, সাঁইথিয়া;

।। মুর্শিদাবাদ ।।

সোমা ও তানি/ব্যারাক স্কোয়ার, বহরমপুর; সুজিত, রীণা, বর্ণা/আজিমগঞ্জ লোকো; স্বপন, জয়া, বিশু, গীতা, অলকা, জয়ন্ত, বাণী ও বরুণা কর্মকার/সৈদাবাদ, নিমতলাপাড়া, খাগড়া; চৈতালি, টুকটুকি ও নিবেদিতা/কান্দি, বাঁধাপুকুর; প্রণতি, সোমনাথ, মামণি, লাল ও সোমা/লালদীঘি, বহরমপুর; তনুশ্রী, অনুশ্রী, শুভঙ্কর/ফারাক্কা ব্যারেজ কলোনী, ফারাক্কা; বাপী, বিল্টু ও বুবাই/কে.কে. ব্যানার্জী রোড, বহরমপুর; বুদ্ধদেব, ভূদেব, গদাই, নোটন, বুড়ন, বিজন, ব্যারস, লালু, রুবেন, চিনু ও মিনু/মধুপুর রোড, বহরমপুর;

।। নদীয়া ।।

শিল্পী, শিপ্রা ও নিশীথ দে/ষষ্ঠীতলা, নবদ্বীপ; শিবাশিস, দেবাশিস ও শুভাশিস বিশ্বাস/বগুলা, কলেজপাড়া; শ্রীদাম সরকার/মিলননগর, বগুলা; অশোককুমার সাহা/বগুলা কলেজ রোড; অমিত, অসিত দালাল/রেল কোয়ার্টার, মাজদিয়া; অরিজিৎ মিশ্র/কল্যাণী; শংকর, বিভা ও জয়ন্ত সেন/গোড়পাড়া, চাকদহ; চন্দনা, পাপিয়া ও টুম্পা লোধ/পালপাড়া, চাকদহ; অতুল, চন্দ্রা, সুমনা/তমালতলা লেন, নবদ্বীপ;

।। উত্তরবঙ্গ ।।

মনোজকুমার রায় ও বিশ্বজিৎ রায়/বি.এস. রোড, মালদা; বাণী, মামণি, বাপ্পী, শিবাণী ও পরিমল সেন/নিউটাউন, আলিপুর দুয়ার, জলপাইগুড়ি; বাসব, সৌরভ, হেনা, কল্পনা/বাঁসুলিতলা, মকদমপুর, মালদহ;

।। বিহার ।।

মিতু, সোনা ও রাণা/জামশেদপুর; সহদেব, সজল, ফকির, নিরঞ্জন, মন্টু, বল্টু ও বাবু হাজরা/কুমারডুবী, ধানবাদ; তুলতুল বিশ্বাস/ল্যাংড়াবাগান, কাটিহার; বাপী, সেন্টু, নিনু/লালবাজার, ঝরিয়া, ধানবাদ; রিচি ও রিমি কোনার/ডোরান্ডা, রাঁচী; পুচুন, মনু, ইভা, মামণি ও ছবি/বিষ্টুপুর, জামশেদপুর; চন্দন, শুভ্রা, সোমনাথ, গুড্ডা ও মানব দাস/গোমো, ধানবাদ; শ্রাবণী, ভারতী, গীতা ও অমলেন্দু ভট্টাচার্য/হীরাপুর, ধানবাদ; অর্চিতা ও মামণি/জামশেদপুর; সোনাই, রূপাই, মুনাই, গৌতম ও উত্তম/দেওঘর; সিমলি, চুমকি, কাজল, সজল ও শম্পা/চাঁইবাসা রেল কোয়ার্টার; অঞ্জু, মাধু, রিন্টু, মানস, উত্তম ও সোনা/টাটানগর;

।। আসাম ।।

শ্যামল, শ্রাবণী, গীতা, রীতম ও উদয়/লামডিং; বকু, ছন্দা, টুকু, খুকু, রাজু, বুজু ও বিপন/শ্রীপুরিয়া, তিনসুকিয়া; সব্যসাচী, প্রীত, শৈলী, সিঁথি ও রঞ্জিত/তাম্বুলবাড়ি, তিনসুকিয়া; তোড়া, কোয়েল, বুড়ো, বাপ্পা ও দীপ/আদর্শকলোনী, মালিগাঁও, গুয়াহাটী; মুক্তা, পাপ্পা ও মায়া/মতিনগর; রাণা, গোপা ও পরাগ সেন/জামতলা, ডিগবয়;

বাকি উত্তর দাতাদের নাম আগামী সংখ্যায়

অগ্রহায়ণ সংখ্যার শব্দমালার উত্তর

			শি	বা	নী			
			শি		লি			
যা	যা	ব	র		মা	য়া	জা	ল
ত								ল
না	রি	কে	ল		ছা	পা	খা	না
			ব		গ			
			ন	ক	ল			

ছবির মজা— মানব বন্দ্যোপাধ্যায়

হচ্ছেটা কি?
ঝগড়া চলছে না বাতি জ্বলছে?

(উত্তর নিচে)

একটি বাদে অন্য সব ছবির মাঝে বিশেষ এক মিল আছে। ব্যতিক্রম কোনটি ও কেন?

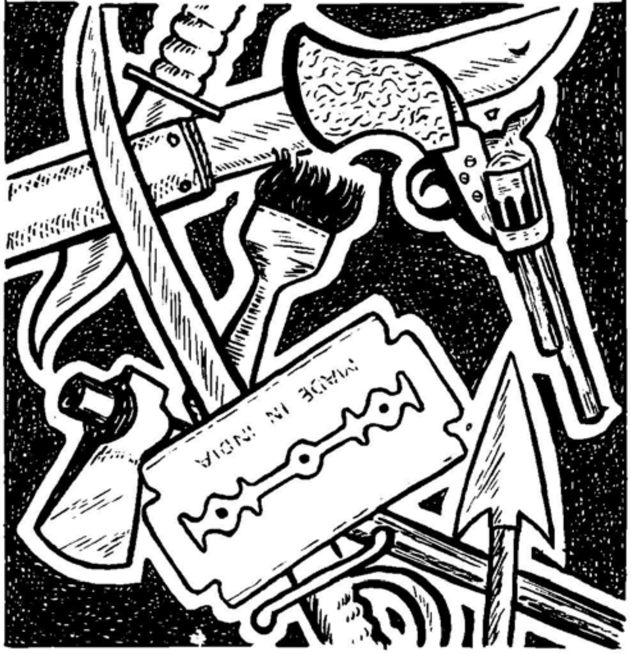

দাড়ি কামানো, পুরুষ মানুষের প্রাচীন অভ্যাস। প্রাগৈতিহাসিক যুগের এই ধরনের ভয়-জাগানো ধাতুর তৈরি দাড়ি কামানোর যন্ত্র, লন্ডনের টেম্‌স নদীর খাত থেকে পাওয়া গেছে।

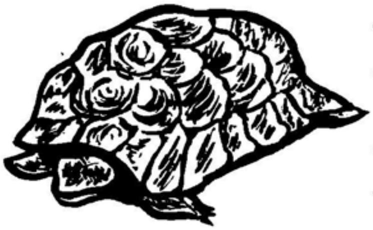

ডাইনোসরাসের চেয়েও পুরনো প্রাণী কচ্ছপ, যারা এখনো টিঁকে আছে। এরা বাঁচেও অনেক দিন। কখনো কখনো ১৫০ বছর বা আরও বেশি।

প্রাচীন ইজিপ্টের আরোগ্যের দেবতা 'হোরে'-কে সম্মান জানিয়ে এই চিহ্নটি এখনো ডাক্তাররা তাঁদের প্রেসক্রিপশনে এঁকে দেন।

ছবির মজার সমাধান

* কি দেখছি তা নির্ভর করছে আমার মনোযোগ কোনখানে তার উপর। অর্থাৎ সাদার ওপর মন ও দৃষ্টি রাখলে দেখবো বাতিদান। কালোতে রাখলে দুটি মানুষের ঝগড়া।

* ব্যতিক্রম ব্রাশ বা বুরুশটি কারণ আঘাত করার জন্যে এটি তৈরি হয় না।

হাঁদা-ভোঁদার
নৌ বিহার
নৌকো আধঘণ্টা ১/- টাকা
ওঃ! আমি যেন সাগরের ঢেউয়ের ওপর দিয়ে নৌকো বেয়ে চলেছি...
তোর সময় পার হয়ে গেছে, ভোঁদা! এবার উঠে আয়!
বাজে বকিস না! মাত্র কয়েক মিনিট আমি নৌকো চড়েছি! আমি এখন উঠছি না!
ঘটনা এই রকম হলে... তোকে সিধে জলের মধ্যে যেতে হবে!
আজ বড়ই গরম! বরং সাঁতারই কাটা যাক!
না, তাও পারবি না! ওকে তুলে আন, ভুলো!
অ্যাই হতচ্ছাড়া কুকুর, ছেড়ে দে বলছি!
হেঃ হেঃ! ভুলোর সঙ্গে কোন রকম জারি জুরি খাটবে না!
কিছু পরে
হঠাৎ সব একেবারে নিস্তব্ধ হয়ে গেলো। একটা খদ্দেরেরও টিকির দেখা পাচ্ছি না!
গরর! ভোঁদাটা ফিরে এসে মালিকের ব্যবসা নষ্ট করছে! কিন্তু ভুলো ওদের ফুলো পাল ফুটো করে খেল খতম করতে জানে!
১০ মিনিট ১০ পয়সা
এরপর আমি, ভোঁদুদা!

ইঁয়েক! এ-এটা আবার কোত্থেকে এলো?
ওরে বাবা! একটা পাল তোলা ছুটন্ত ডাঙা নৌকো! এটা আমাকে ভয় পাইয়ে দিয়েছে!
তোমার কুকুরের জন্যেই এটা হয়েছে! ওর ঘুড়িটা আনিয়ে দাও!
এটা কোন সমস্যাই নয়!
আমি চুপি চুপি এটা ভুলোর সঙ্গে বেঁধে দি!
ঘুড়িটা নিয়ে আয়, ভুলো!
অ্যাই মরেচে! আমার ঘর যে ছুটছে!
হেঃ হেঃ! হাঁদার কুকুর ওকে পুকুর দেখাতে নিয়ে যাচ্ছে!
এখুনি ফিরে এসো, হাঁদা! তোমার চাকরির মেয়াদ শেষ!
কি-কিন্তু আমি সাঁতার জানিনা, স্যার!

দাদুমণির চিঠি

শুকতারার বন্ধুরা,

ভালো আছো তো সকলে? আসি আসি করে শীত তাহলে এসেই গেলো। হু হু করে বইছে উত্তরে হাওয়া। বয়ে আনছে হিম। যেন শীতের বুড়ি তার কাঁথাটা তুলে নিয়েছে, অমনি কাঁথার মধ্যে আটকে থাকা ঠান্ডা ছুটে এসে জাঁকিয়ে বসেছে। শীতকালটা কিন্তু দারুণ—তাই না? ক্রিকেট খেলা, বনভোজন, ভালো-মন্দ খাওয়া, বেড়ানো—আরো কতো কী! নতুন গুড়ের সন্দেশ, জয়নগরের মোয়া, পাটালি, মটরশুঁটি, কপি আরও কতো রকম জিনিস। আর বাগানের দিকে তাকিয়ে দেখো গাঁদা ফুল যেন আলো করে রেখেছে। কার বাগানে কতো বড় ডালিয়া ফুটলো তাই নিয়ে কমপিটিশান। প্যানজি, সুইট পি, চন্দ্রমল্লিকা আরো কতো রকমের বাহারি ফুলের মেলা। যাদের গোলাপ ফুলের শখ তাদের বাগান তো এখন রংয়ে, গন্ধে মাতিয়ে দিচ্ছে সকলকে। সেইজন্যেই বোধহয় শীতকে শ্রেষ্ঠ ঋতু বলা হয়।

এখন রাত্তিরটা অনেক বড় দিন ছোট। দেখো না বিকেল হতে না হতেই সন্ধ্যে গড়িয়ে আসে। অথচ ২৫শে ডিসেম্বরকে বড় দিন বলা হয়। সত্যিই তো আর ঐ দিনটা বড় নয়। রাত্তিরের চেয়ে অনেক ছোট। তবে ঐ দিনই তো যীশুখৃষ্টের জন্ম। আসলে ২১শে ডিসেম্বরের পর থেকে সূর্যের আলো মকরক্রান্তি পেরিয়ে উত্তর দিকে পড়তে শুরু করে। ফলে রাত্তিরের আয়তন একটু একটু করে কমতে শুরু করে এই সময় থেকেই। তবে রাত্তিরকে হারিয়ে দিয়ে বড় হতে দিনের আরও অনেক সময় লাগে। আর কিছুদিনের মধ্যেই দেখবে বিকেলটা আস্তে আস্তে বড় হচ্ছে।

মাধ্যমিকে দ্বিতীয় হয়েছে অগ্নিমিত্র বিশ্বাস। সে পুরস্কার নিচ্ছে মুখ্যমন্ত্রীর হাত থেকে।

মুখ্যমন্ত্রী শ্রীজ্যোতি বসুর হাত থেকে সুবোধচন্দ্র মজুমদার স্মৃতি পুরস্কার নিচ্ছে মাধ্যমিক পরীক্ষায় প্রথম স্থান পাওয়া ছাত্র সব্যসাচী ব্যানার্জি।

মাধ্যমিকে যুগ্মভাবে তৃতীয় হয়েছে রুচিরা মজুমদার ও অপরাজিতা রায়চৌধুরী। তাদের হাতে মুখ্যমন্ত্রী তুলে দিচ্ছেন সুবোধচন্দ্র মজুমদার স্মৃতি পুরস্কার।

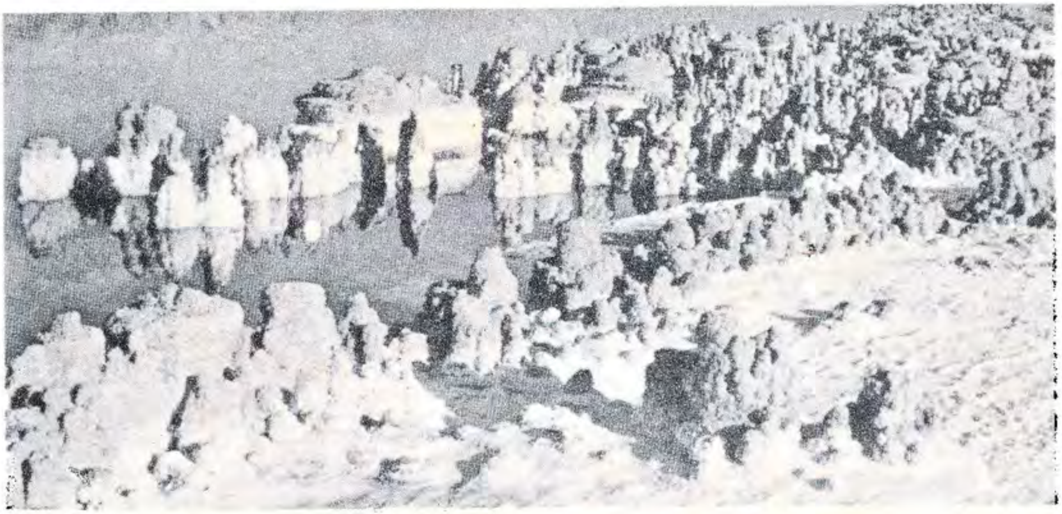

ডেড সিতে জমা নুনের পাহাড়

আমাদের এক বন্ধু জানতে চেয়েছে ডেড সি বা মৃত সাগর ব্যাপারটা আবার কি? সাগর মরে যায় নাকি?

আমার যেন মনে পড়ছে অনেক দিন আগে ডেড সি নিয়ে একবার লিখেছিলাম। যাক গে! সে তো অনেকদিনের কথা। ডেড সি বা মৃত সাগর সত্যিই আছে। ইজরায়েল আর জর্ডন রাজ্যের মধ্যে এই ডেড সি। জেরুসালেম শহরের নাম নিশ্চয়ই শুনেছো। তার পশ্চিমে ১৫ মাইল দূরে সমুদ্র। খৃষ্টানদের পবিত্র নদী জর্ডান এসে পড়েছে ডেড সিতে। এই সমুদ্রের আয়তন ৩৬০ বর্গমাইল। দারুণ গভীর। এই সমুদ্রটি পৃথিবীর সব থেকে নিচু অংশে। সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে ১৩০০ ফুট নিচে। আর যত গোলমাল সেই জন্যেই।

নিচু বলে এই সাগরের জল কোনো নদী বা কিছু দিয়ে বেরিয়ে যেতে পারে না। ওদিকে জলে নুনের ভাগ ভীষণ বেশি। সব থেকে মুশকিল হলো ঐ অঞ্চলে বৃষ্টি ধরতে গেলে হয়ই না। রোদের তেজও খুব। রোদের তেজে রোজ আধ ইঞ্চির মতো জল বাষ্প হয়ে উড়ে যায়। নুন তো আর বাষ্প হবে না। তাই রোজই জলে নুনের ভাগ বাড়তে থাকে।

ফলে ঐ সমুদ্রের জলে শুধু নুন আর নুন। এতো নুন যে জায়গায় জায়গায় নুন গলেই না। বরফের মতো জমাট বেঁধে থাকে। শুধু কি তাই—অতো নুন বলে কোনো কিছুই ওখানে বাঁচতে পারে না। জর্ডান নদী-টদি দিয়ে যেসব মাছ-টাছ ভেসে আসে তারা এসেই মরে যায়। কোনো কিছুই বাঁচে না বলে ঐ সমুদ্রকে ডেড সি বা মৃত সাগর বলা হয়।

আর একটা মজার ব্যাপার কি জানো? ঐ সমুদ্রে কোনোদিন কেউ ডুবে যাবে না। সাঁতার না জানলেও ভেসে থাকবে। অতো বেশি নুন বলে ভেসে থাকবে। তাই যদি জিজ্ঞেস করা হয়, সাঁতার না জেনেও কেউ কোন সমুদ্রে ডোবে না? তাহলে উত্তর তোমরা নিশ্চয়ই দিতে পারবে! ভারী মজার ব্যাপার না? এই পৃথিবীতে কতো যে মজার জিনিস আছে!

ও সব কথা থাক। অন্য প্রসঙ্গে আসি। তোমরা নিশ্চয়ই সুবোধচন্দ্র মজুমদারের নাম শুনেছো। তিনি ছিলেন দেব সাহিত্য কুটীরের প্রাণপুরুষ। ছোটদের ভীষণ ভালোবাসতেন। ছোটরা কি চায়, কি পড়তে ভালোবাসে তা জানতেন তিনি। ভেবে চিন্তে দারুণ দারুণ সব বই বের করেছিলেন তিনি। তাঁর আগে ছোটদের জন্যে এমন সুন্দর সুন্দর বই আর কেউ ছাপেন নি। কতো ধরনের, কতো বিষয়ের সব বই—রং-বেরংয়ের ছবিতে ভরা বইগুলো ছোট বড় সকলেরই প্রিয়। শুধু কি তাই! তিনি আরও একটা ব্যবস্থা করে গেছেন। প্রত্যেক বছর মাধ্যমিক পরীক্ষায় যারা প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় হবে তারা অন্য সব পুরস্কারের সঙ্গে পাবে আর্থিক পুরস্কারও। যে প্রথম হবে সে পাবে পাঁচ হাজার টাকা, দ্বিতীয় আর তৃতীয় হবে যারা তারা পাবে তিন ও দু'হাজার টাকা।

কিছুদিন আগে এক অনুষ্ঠানে এবার যারা প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় হয়েছে তাদের হাতে মুখ্যমন্ত্রী শ্রীজ্যোতি বসু নিজে তুলে দিয়েছেন সুবোধচন্দ্র স্মৃতি পুরস্কার। এবার প্রথম হয়েছে সব্যসাচী ব্যানার্জি, দ্বিতীয় অগ্নিমিত্র বিশ্বাস এবং যুগ্মভাবে তৃতীয় স্থান লাভ করেছে অপরাজিতা রায়চৌধুরী ও রুচিরা মজুমদার। ছবিতে তোমরা তো এবারের কৃতী ছাত্র-ছাত্রীদের দেখতেই পাচ্ছো। তোমরাও চেষ্টা করো, মন দিয়ে পড়াশোনা করতে, তাহলে সব্যসাচী, অগ্নিমিত্র, অপরাজিতা বা রুচিরার মতো তোমরাও ভালো রেজাল্ট করতে পারবে। পুরস্কার পাবে।

আজ তাহ'লে এই পর্যন্তই।
ভালো থেকো সকলে।
আদর আর ভালোবাসা নাও।
জয়হিন্দ।

—তোমাদের দাদুমণি

তোমাদের পাতা

অপরাজিতা বিশ্বাস
বয়স তেরো, অষ্টম শ্রেণী, মডার্ন হাইস্কুল, কলিকাতা

গাছের কান্না

প্রত্যেক বছরের মতো মহাষ্টমীর রাতে বাবা-মার সঙ্গে এবারও আমি ঠাকুর দেখতে বেরিয়েছিলাম। ঘুরতে ঘুরতে কলকাতার এক নামকরা পুজোমন্ডপে হাজির হই। সেখানে শুধু পুজো নয়, এক সুন্দর প্রদর্শনীরও আয়োজন করা হয়েছিল। ঠাকুর নমস্কার করে আমি প্রদর্শনী দেখতে যাই। প্রদর্শনীর একটা বইয়ের দোকানে গাছ সম্বন্ধে নানারকমের বই বিক্রি হচ্ছিল। দোকানটার আশেপাশে কয়েকটা পোস্টারে লেখা ছিল, "প্রাণ বাঁচাতে গাছ বাঁচাও", "গাছ আমাদের জীবন" ও "একটি গাছ শত পুত্র হতেও মূল্যবান"। কিন্তু আমি দেখে চমকে উঠলাম যে ঠিক সেই দোকানটার পাশেই একটা ছোট্ট কৃষ্ণচূড়া গাছ প্রায় পাঁচশ জ্বলন্ত রঙিন বাল্ব ও টিউব লাইট দিয়ে সাজানো হয়েছে। আমি সঙ্গে সঙ্গে পুজো কমিটির অফিসে গিয়ে গাছের ওপর এই অত্যাচারের প্রতিবাদ জানাই এবং এর প্রতিকার করতে অনুরোধ করি। কিন্তু কেউ আমার অনুরোধ রাখলেন না, উল্টে বললেন, 'খুকি, গাছে আলো না দিলে কি আর চটক খোলে? দেখ না...পাড়ায় সব গাছেই আলোর খেলা চলছে। আমাদের ভাগে তো পড়েছে মাত্র ক'টা গাছ।'

লজ্জায় মুখ নিচু করে আমি পুজোমন্ডপ থেকে বেরিয়ে গেলাম। বড়রা বলেন যে গাছেরা নিরীহ, নির্বাক জীব, এরা কোনো প্রাণীর কোনো ক্ষতি করে না। তাঁরা বনমহোৎসব করেন, উপদেশ দেন গাছ লাগাতে এবং গাছ রক্ষা করতে। কিন্তু একটা ছোট গাছকে হাজার হাজার ওয়াট্সের বিদ্যুৎ দিয়ে সাজানোর মানে তাকে শুধু শাস্তি দেওয়া নয় কি? কোনো মানুষকে যদি পাঁচটা জ্বলন্ত বাল্ব ও অজস্র তার দিয়ে বাঁধা হয় তবে কি সে ব্যথা পাবে না, প্রতিবাদ জানাবে না? যেহেতু গাছেরা কথা বলতে বা প্রতিবাদ জানাতে পারে না, মানুষ কি তাই দিনের পর দিন গাছেদের ওপর এরকম অত্যাচার করবে? সাজাবার শত রকম পদ্ধতি থাকা সত্ত্বেও এরা জ্বলন্ত বাল্ব দিয়েই গাছ সাজান। এই সাজ-সজ্জা আমাদের কাছে ভাল লাগতে পারে কিন্তু গাছেদের কাছে এটা একটা ভয়াবহ ব্যাপার। আমরা নিষ্ঠুর, তাই গাছেদের কান্না আমরা শুনতে পাই না।

পরের দিন থেকে আমি আলোয় সাজানো গাছেদের দিকে তাকাতে পারছি না। সব সময় আমার মনে হয় আমাকেও কেউ যেন একদিন এইরকম জ্বলন্ত অলংকার দিয়ে সাজাবে। আমি জানি, আমার একার কণ্ঠ মানুষের অমানুষিক অত্যাচার থেকে গাছেদের বাঁচাতে পারবে না। তাই তো, শুকতারা'র প্রিয় বন্ধুগণ, এসো, সবাই মিলে আমরা এর প্রতিবাদ করি, মানুষের নিষ্ঠুর হাত থেকে প্রকৃতি মায়ের এই নিরীহ জীবগুলোকে রক্ষা করি। আর এইভাবেই আমরা আমাদের উৎসবের দিনগুলোকে সর্বাঙ্গসুন্দর করে তুলি।

জয়িতা চক্রবর্তী
বয়স বারো, সপ্তম শ্রেণী, লরেটো ডে স্কুল, শিয়ালদহ

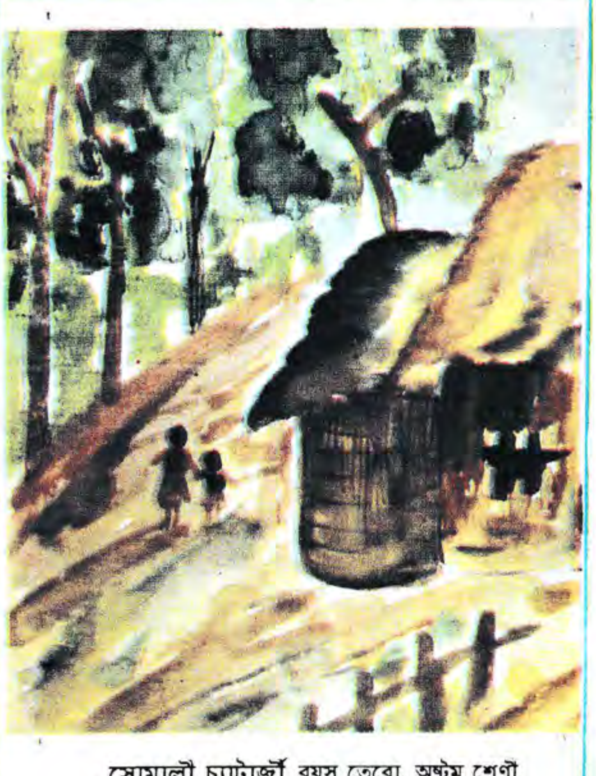

সোমালী চ্যাটার্জী, বয়স তেরো, অষ্টম শ্রেণী
পাঠভবন, শান্তিনিকেতন, বীরভূম

৯ বছরের মধুরিমা আঁকছে হাতী সার্কাসের নিমের গুণে দন্তজোড়া সাদা, তাজা ঝরঝরে!

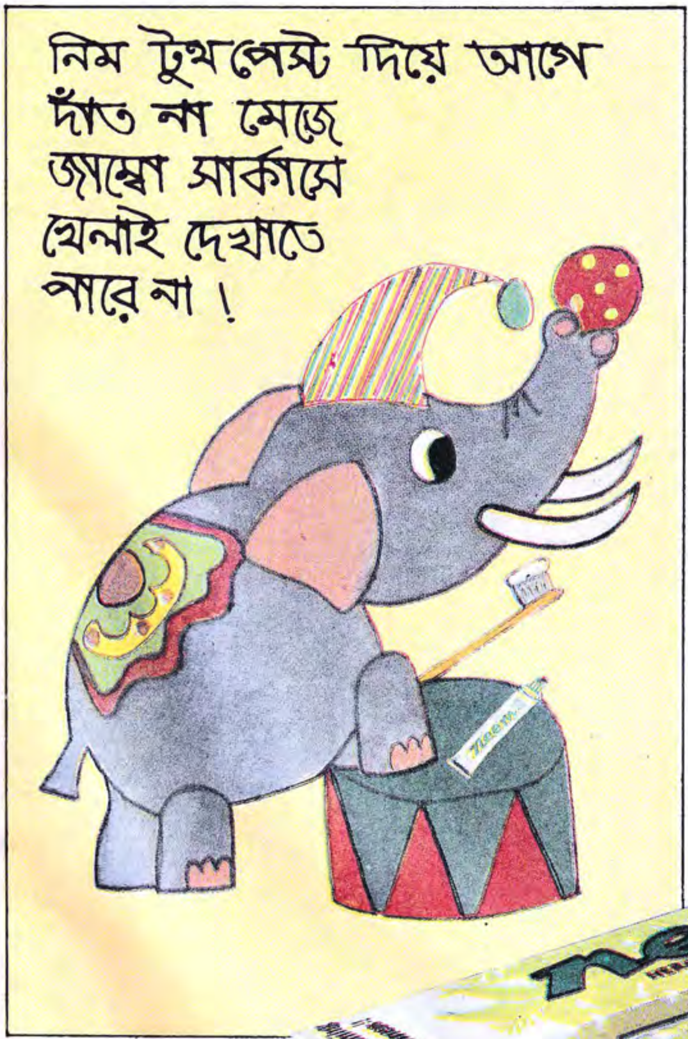

পাঠিয়েছে মধুরিমা বিদ্যার্থী
বয়স ৯ বালিগঞ্জ প্লেস,
কলিকাতা

ঝর ঝরে তাজা নিম টুথপেস্ট। নিম দিয়ে তৈরি একমাত্র টুথপেস্ট। প্রকৃতির দান আশ্চর্য ভেষজ নিম। দাঁত সবল এবং মাড়ী সুস্থ রাখতে নিম-এর মত আর কিছু নেই।

এখন ঝাঁজাল নিম টুথপেস্ট মুখে দিলেই এমন ঝরঝরে লাগে যে বাচ্চারা অনেকক্ষণ ধরে দাঁত মাজতে চাইবে। তাই নিম থেকে উপকারও পাবে অনেক বেশি।

নিম দিয়ে দাঁত মাজতে মাজতে নিম তোমার কেমন ভালো লাগে তার ওপর একটা বিজ্ঞাপন এঁকে ফেল তো। তারপর নিচের কুপনের সঙ্গে গেঁথে সেটা পাঠিয়ে দাও। কে জানে, হয়তো দেখবে তোমার বিজ্ঞাপনটিই কাগজে ছেপে বেরিয়েছে। কী দারুণ হবে বল তো!

ঝর ঝরে তাজা
কি মজা!

নিম
টুথপেস্ট

কাজেও ভালো, স্বাদেও ভালো

এই বিজ্ঞাপনটি আমি এঁকেছি নিম টুথপেস্ট-এর জন্য।
নিম টুথপেস্ট আমার দারুণ ভালো লাগে! আমার বিজ্ঞাপনটি ছাপলে খু-উ-ব খুশি হব।

আমার নাম .... বয়স ....
স্কুল ....
বাড়ীর ঠিকানা ....
বাবা/মা বা অভিভাবকের স্বাক্ষর ....

ডাকযোগে এই ঠিকানায় পাঠাও : নিম টুথপেস্ট, দি ক্যালকাটা কেমিক্যাল কোম্পানি লিমিটেড, ৩৫ পণ্ডিতিয়া রোড, কলকাতা ৭০০ ০২৯
কুপ[illegible] সঙ্গে পাঠানো সব বিজ্ঞাপনই হবে ক্যালকাটা কেমিক্যাল-এর সম্পত্তি।

ST

ক্যালকাটা কেমিক্যাল-এর উৎপাদন

23A BEN

ভূতুড়ে অংক

অংক জগতের জাদু

জাদুকর পি. সি. সরকার (জুনিয়র)

দর্শকদের একজনকে একটা কাগজ আর পেন্সিল দিয়ে জাদুকর তাঁকে তিন অঙ্কের একটা সংখ্যা লিখতে বললেন। তবে হ্যাঁ, সংখ্যাটার প্রথম এবং তৃতীয় অঙ্কের বিয়োগফল যেন এক-এর বেশি হয়। ধরা যাক তিনি লিখেছেন 356; এর প্রথম এবং তৃতীয় অঙ্কের, অর্থাৎ 3 এবং 6 এর তফাৎটা এক-এর চেয়ে বেশি, সুতরাং এই সংখ্যা দিয়ে ম্যাজিকটা দেখানো চলবে। এবার জাদুকর ওই সংখ্যাটাকে উল্টে লিখে প্রথমে দেওয়া সংখ্যাটা দিয়ে বিয়োগ করতে বললেন। অর্থাৎ 356...এটা হলো দর্শকের দেওয়া সংখ্যা, এটা উল্টে লিখলে 653 হয়। এই 653 থেকে 356কে বাদ দিতে বলা হচ্ছে।

অনেক সময় সংখ্যাটা উল্টোলে আসল সংখ্যাটার চেয়ে ছোট হয়ে যেতে পারে। সেক্ষেত্রে আসল সংখ্যা এবং উল্টে লেখা সংখ্যা, এই দুই-এর মধ্যে যেটা বড় সেটাকে ওপরে রেখে ছোট সংখ্যাটা দিয়ে বিয়োগ করতে হবে।

তা যাই হোক, 653 থেকে 356কে বাদ দিয়ে 297 পাওয়া গেল। বুঝবার সুবিধের জন্য এই উত্তরটার নাম দেওয়া যাক প্রথম উত্তর। জাদুকর এই প্রথম উত্তরটাকে বললেন আবার উল্টে লিখতে এবং তারপর এই উল্টে লেখা সংখ্যাটার সঙ্গে প্রথম উত্তরটাকে যোগ করতে। অর্থাৎ 297 উল্টে হলো 792, এর সঙ্গে 297কে যোগ করতে হবে। যোগফল হিসেবে 1089 পাওয়া গেল। এবার জাদুকর একটা মোমবাতি জ্বেলে তার আগুনের সামনে কাগজটাকে ধরলেন। কী অবাক ব্যাপার! কাগজটার উল্টো পিঠে ম্যাজিকের মতোই 1089 উত্তরটা ফুটে উঠলো। দর্শকেরা নিজেদের ইচ্ছে মতোই সংখ্যা লিখেছেন—পুরো যোগ বিয়োগ তাঁরা নিজেরাই করেছেন—কিন্তু তবুও ওই কাগজে কীভাবে ম্যাজিকের মতো উত্তরের সংখ্যাটা ফুটে উঠলো তা দেখে সবাই চমকে গেলেন।

একটা মজার হিসেবের সঙ্গে রাসায়নিক চমক মিশিয়ে এই নাটকীয় ম্যাজিকটা তৈরী করেছি। ব্যাপারটা হলো, দর্শকেরা যে সংখ্যাই লিখুন না কেন, ওপরের শর্ত অনুযায়ী যোগ-বিয়োগ করলে শেষ-পর্যন্ত উত্তরটা সবসময় 1089 হবে। এটা হচ্ছে একটা গাণিতিক আইন। সুতরাং উত্তরটা যে 1089 হবেই তা জাদুকরের আগের থেকেই জানা ছিল। সেই অনুযায়ী সাদা কাগজটাতে আগের থেকে পাতিলেবুর পরিষ্কার রস দিয়ে 1089 সংখ্যাটা লিখে লুকিয়ে রাখা ছিল। শুধু খেয়াল রাখতে হবে—ওই লেখার দিকে যেন দর্শকেরা তাঁদের হিসেব-টিসেব না করেন। সবই যেন উল্টো পিঠে করা হয়। কাগজটাকে মোমবাতির আগুনের সামনে আনলে তার উত্তাপে ওখানকার জলীয় বাষ্প উপে যাবে। রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় নিজের থেকেই ওই লেবুর রসের লেখাটাকে কালো কালির মতো ফুটিয়ে তুলবে। ঠিক মনে হবে যেন ভূতুড়ে লেখার মতোই উত্তরটা ফুটে উঠছে।

উত্তরটা সব সময়েই 1089 হয় বলে এই খেলাটা একবারের বেশি কখনই দেখানো ঠিক নয়। দর্শকেরা যদি বুঝে যান যে উত্তরটা সব সময় ওই একই হয় তাহলে তো আর কোনোও মজাই থাকবে না। তাই নয় কি?

[চলবে]

আফ্রিকার জঙ্গলে

অমিয়কুমার হাটি

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

অ্যাম্বোসেলির বন থেকে ফিরে চলেছি। বেশ বেলাই হয়ে গেছে। তবু ইতি উতি খুঁজছি। আরো যদি কিছু দেখা যায়!

নিরাশ হতে হলো না। একটা গাছের আড়ালে কারা যেন দাঁড়িয়ে? নজর এড়ায় না আমাদের চালকের। একেবারে কাছাকাছি এসে পড়ি। দুটি চিতা!

গতকাল বিকালেও দেখেছিলাম একটা চিতা—সে তখন ওৎ পেতেছে শিকার ধরতে, আমাদের থোড়াই কেয়ার করেছে, সবটুকু নজর তার শিকারের উপর—কখন তাড়া করবে, ঝাঁপিয়ে পড়বে! সে একটা দেখার মতো জিনিস! আর আজ একী হলো! আমাদের সাড়া পেয়েই, এগিয়ে আসতে দেখেই দে ছুট, দে ছুট!

বোধহয় তা নয়। আমাদের গাড়ির চালক এবং গাইড জুলিয়াস সীজার বড়ই আমুদে। সে বলল, "শোন তোমরা, আমি বাজি রেখে বলছি, ওরা এখানকার নয়। এ বনের নয়, অনধিকার প্রবেশ করেছে, পাশপোর্ট বোধহয় পকেটে নেই ওদের, ভেবেছে আমরা দেখতে এসেছি ওদের পাশপোর্ট, তাই পালালো।"

—"কিন্তু কী জোরে ছুটছে!" বলি।

—"জানো তো," শুরু করে চালক, "পৃথিবীর কোনো মোটর গাড়ি এত তাড়াতাড়ি গতি তুলতে পারে না। ওরা দু সেকেন্ডের মধ্যেই কিন্তু ৭৫ কিলোমিটার (৪৫ মাইল) গতিলাভ করতে পারে। জীবজগতে সবথেকে দ্রুতগামী হলো চিতা। ঘণ্টায় ছুটতে পারে ১২০ কিলোমিটার (৭৫ মাইল) বেগে।"

—"তাহলে হরিণ বা অন্য জীব রেহাই পায় কী করে?" শুধাই।

—"কী জানো," বকবক শুরু করে আবার আমাদের চালক, "মনের জোর ওদের একদম নেই। একটা শিকারের পিছনে তাড়া করল, যদি কয়েকশো মিটার দৌড়ে নাগাল না পায় তার, তাহলে ধাওয়া করা ছেড়ে দেয়। চিতা আসলে বিড়াল বংশেরই, তবে স্বভাব বেশিটা শিকারী কুকুরের মতোই। বিড়াল তো চুরি করে খায়। চিতাও যে করে না তা নয়, কিন্তু প্রকৃতির সংসারে চুরি করে খেয়ে চিতা বাঁচতে পারে না—তাকে তাই তাড়া করে শিকার ধরতে হয়। প্রকৃতির বিধানও তেমনি। সবথেকে গতি বেশি থাকলে কী হবে, মনের জোর নেই।"

কথায় কথায় অনেকদূর চলে এসেছি। অ্যাম্বোসেলি জঙ্গলের সীমানা ছাড়ালাম। বুকটা কেমন যেন ভীষণরকম টনটন করে উঠল। একেবারেই এক আলাদা জগতের অতিথি হয়ে ছিলাম। একদম অপরিচিত পরিবেশ। কত সজীব! দেখলাম যেন আদিম পৃথিবীর আলো আঁধারে মেশা অনাবিল রূপ। শুনলাম যেন বহমান জীবনের হাসিকান্না মাখানো গান।

আমাদের গাড়ির গতি এখন চিতার গতির সমান। ফিরে চলেছি নাইরোবি, মাসাই ভাষায় যার মানে হলো "ঠান্ডা

মায়ের কোলে শিশু শিম্পাঞ্জী

জলের জায়গা"–শহরটা একটা মালভূমির উপর, অতি আধুনিক, সাগরতীর থেকে উঁচু ১৮২০ মিটার। ৯ লাখ লোকের বাস। কেনিয়া রাজ্যের সব থেকে বড় শহর এবং রাজধানী–১৯০৭ সাল থেকে। কেনিয়া পূর্ব আফ্রিকার একটি দেশ–মানচিত্রটা দেখতে অনেকটা যেন গেঞ্জির মতো। রাজ্যটির এলাকা প্রায় ৬ লাখ বর্গ কিলোমিটার, লোকসংখ্যা দেড়কোটির কিছু বেশি। এই কেনিয়ার অন্যতম দ্রষ্টব্য সংরক্ষিত বন অ্যাম্বোসেলি।

বিশাল বড় বড় বাড়ি, মসৃণ ঝকমকে পথ, রঙচঙে গাড়ি, লোকজন, আলোর রোশনাই নাইরোবিতে। অতি আধুনিক বললেও ভুল বলা হয় না। কলকাতা থেকে আসার আগে অনেকের কাছেই শুনেছিলাম, গরমে মরে যেতে হবে। বিশেষতঃ জুন মাসে, আফ্রিকায়। কিন্তু নাইরোবিতে সারা বছরই শীতের আমেজ, আবহাওয়া একই রকম। পনেরো-কুড়ি কিলোমিটার দূরেই নাইরোবির সংরক্ষিত জাতীয় বন।

শহরের কাছে বলে বনের জীবরা কিছু কম নেই এখানে। আছে ১00 ধরনের জন্তু, 800 রকমের পাখি। সবুজ গলার হাঁস, কালো ঘাড়ওয়ালা চিল, ইজিপ্সিয়ান শকুন, মার্শাল ঈগল, সেক্রেটারি পাখি, কটাই বা চেনা যায়, কত নামই বা মনে রাখা যায়! তবে মনে থাকবেই উটপাখি, পাখিদের ভেতর সব থেকে বড়, আড়াই মিটার উঁচু বড় বলেই ঝামেলা। বেচারা উড়তে পারে না, যদিও দুপায়ে ছুটতে পারে, এবং গতিও কম নয়–ঘন্টায় ষাট কিলোমিটার (৩৫ মাইল)। আটঘন্টা এক নাগাড়ে ছোটা উটপাখির কাছে কিছুই নয়।

কতকগুলো উটপাখি, দেখি নাচছে। নাচছে যেন আমাদের দেখাতে। এক ঝাঁকে গোটা কুড়ি উটপাখিও থাকতে দেখেছি।

পুরুষ উটপাখি কালো, ডানা দুটো সাদা, পালক লম্বা। মেয়ে উটপাখির রঙ তামাটে। পুরুষ গর্ত খোঁড়ে–কতকগুলো মেয়ে উটপাখি ডিম পাড়ে ঐ গর্তে–সাধারণত ১৫ থেকে কুড়িটা, কখনও বা আরও বেশি–80টা ডিম থাকতে পারে একসঙ্গে। ২০-২৫টা মুরগীর ডিম এক করলে হবে একটা উটপাখির ডিম। শুধিয়েছিলাম, "খেতে কেমন ?"

খায় না কেউ বড় একটা। মুরগীর ডিমের মতই, জলে সেদ্ধ করতে সময় লাগবে দু ঘন্টা! ডিমের বহিরাবরণ বেশ কঠিন, তাহলে হবে কি–ঈজিপ্সিয়ান ঈগল জানে কী ভাবে ভাঙতে হয়–ঠোঁটে নেয় এক টুকরো পাথর, তাই দিয়ে ঠুকরে উটপাখির ডিম ভেঙে খায়!

ভয় পেলে, বিপদ এগিয়ে আসছে দেখলে উটপাখি কি বালিতে মুখ গুঁজে দেয় ? লোকের তাই ধারণা। ভুল ধারণা। তবে শিশু উটপাখি ভয় পেলে চিৎপটাং হয়ে শুয়ে পড়তে পারে বালির উপর। তখন তাদের দেখাও যায় না। প্রকৃতিতে লুকোবার এ এক কায়দা।

উড়তে পারে না তাতে কি–ঘুরে বেড়াতে পেলে কিছু আর চায় না উটপাখি। সারা আফ্রিকা টহল দেয়। অনেক সময় দেখেছি জেব্রা বা গ্যাজেলের দলেও।

সবথেকে অভিনব লেগেছে নাইরোবি জাতীয় সংরক্ষিত বনের লাগোয়া জন্তুশাবকদের অনাথ আশ্রমটি। যত চোট খাওয়া, কমজোরী, অনাথ, আতুর, অসহায়, সম্বলহীন, পরিত্যক্ত, হারিয়ে যাওয়া, কুড়িয়ে পাওয়া শিশু জন্তুকে তুলে আনা হয়, রাখা হয়, সেবা-যত্ন চিকিৎসায় সুস্হ সবল করে তোলা হয়, কারুকে কারুকে মনে ধরলে এবং তাদের পছন্দ হলে রেখে দেওয়া হয়। বাকীদের আবার ছেড়ে দিয়ে আসা হয় বনে, তাদের আপন পরিবেশে যায় ফিরে।

এই রকম একটা থেকে যাওয়া ধাড়ী সিংহকে দেখে বড় দুঃখ হলো। বনের রাজার এ কী শোচনীয় পরিণতি! মাছি ভনভন

করছে তার মুখে গায়ে, হারিয়েছে বল, বড় অসহায়, বেমানান লাগছিল এই পরিবেশে।

সেই শিম্পাঞ্জীটাকেই বা ভুলি কী করে, নাম যার সুইসি জন। বেচারার নেশা ধরে গেছে সিগারেটের। নিজের পকেটে পয়সা কোথায়, চেয়েই নেয়, যারা তাকে দেখতে আসে তাদের কাছ থেকে। যেমন সিগারেটটা ধরিয়ে তার হাতে ধরিয়ে দিল আমাদের গাড়ির চালক। সিগারেট খেয়ে ধোঁয়া ছেড়ে মৌজ করে, হেসে, উঠে গেল গাছের উপরে। শেষ সুখটান দিয়ে এই এতটুকু থাকতে ছুঁড়ে ফেলে দিল। একে কি নেশা ধরানোটা ঠিক হয়েছে? মানুষের বদনেশা মানুষেই থাক্ না–পশুকে ধরানো কেন আবার?

বুদ্ধির দৌড়ে মানুষের ঠিক নিচেই শিম্পাঞ্জী, অনেক আচার আচরণও তার মানুষের মতো। যদিও থাকে গাছে, আফ্রিকার জঙ্গলে, ঘনবর্ষা হয় যেসব জায়গায়। শিম্পাঞ্জী পরিবারে থাকে মা-বাবা ও কয়েকটা শিশু। মূলতঃ ফল খায়। তবে, খেতে ভালবাসে উইপোকা। উইঢিবি তো অনেক আফ্রিকার বনে! একটা কাঠি ঢুকিয়ে দেয় উইঢিবির ভিতরে। উইগুলো কামড়ে ধরে কাঠিটা। তখন সেটা টেনে এনে কুটকুট করে উইপোকা খায়। কোনো কোনো এলাকায় শিকারেও বেরোয়। খরগোশ, ছোট বানর বা ঐ ধরনের জীব শিকার করে তারপর নিজেরা ভাগযোগ করে খায়।

তাদের সব থেকে বড় শত্রু চিতা। ভয় করে না। কারণ জঙ্গলে বাঁচার লড়াই তো অহরহ। এরা করে কি, চিতা দেখলেই গাছের ডালপালা ভেঙ্গে হাতে নেয়, তাই নিয়ে সবাই হৈ হৈ করে চিতাকে তাড়া করে, তখন চিতাও ভয়ে পালায়।

মাটিতে বাস করে না বুঝি এই কারণেই যে, গাছের উপর কুটির বেঁধে থাকা এদের কাছে অনেক নিরাপদ–গভীর জঙ্গলের ভিতর। মায়ের কাছে থাকে শিশুরা, বাবা একটু নিচে থেকে পাহারা দেয়, যাতে বিপদ আপদ না ঘেঁষতে পারে।

কেনিয়া শহরের লোকসভা ভবন

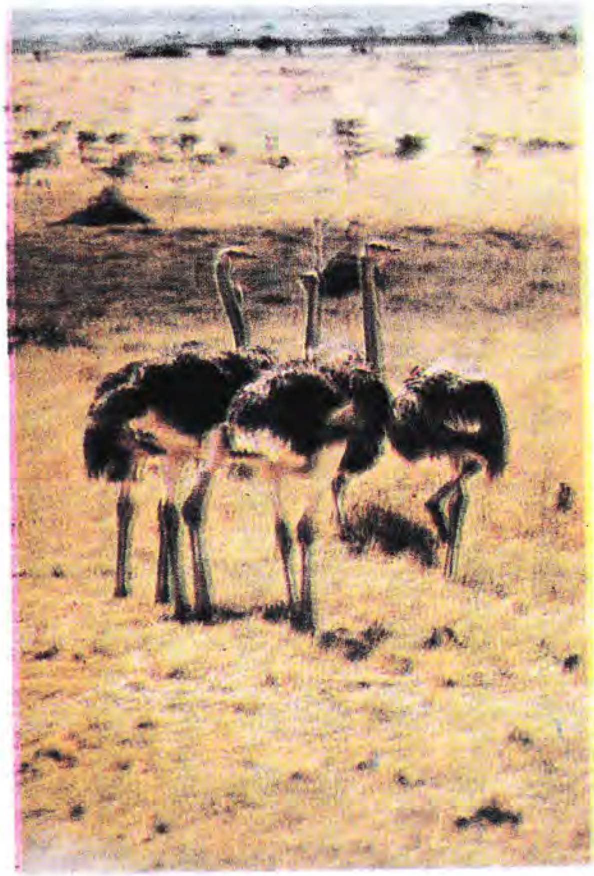

ঘুরে বেড়াতে পেলে আর কিছু চায় না উটপাখি

শিম্পাঞ্জী কথা বলতে পারে না, কিন্তু নানা ধরনের শব্দ করতে পারে মুখ দিয়ে এবং এইভাবে তারা একে অপরকে বোঝাতে পারে। এ ছাড়া তাদের মুখের নানা অঙ্গভঙ্গীর মাধ্যমেও তারা মনের ভাব জানায়।

শিশু ভয় পেলে করে কি? ধরে গিয়ে তার মায়ের হাত। শিম্পাঞ্জী শিশুও ভয় পেলে আগে হাত বাড়িয়ে দেয় মায়ের দিকে।

আফ্রিকাতেও বন কেটে বসত বাড়ছে। শিম্পাঞ্জীদের এলাকাও কমে আসছে ধীরে ধীরে।

জঙ্গলের ঘরদোর সংসারও ছারখার হতে বসেছে। পরিবারও সীমিত। কোথায় যায় তবে বেচারারা এখন? এদেরও তাই পৃথিবী থেকে বিদায় নেবার বাজনা বেজে উঠেছে।

[চলবে]

মাসের নাম জানুয়ারি

আরতি বসু

স্যাবাইন টাটিয়াসের সৈন্য ঘিরে রেখেছে রোম নগরীকে। যুদ্ধ চলছে বেশ কিছুদিন ধরে কিন্তু কিছুতেই কাবু করা যাচ্ছে না রোমানদের। দুর্গ অধিকার করা দূরে থাক নিজের সৈন্যদের রসদ যোগানোই এখন মুশকিল। টাটিয়াস অস্থির ভাবে পায়চারি করছেন তাঁবুর সামনে। এমন সময় গুপ্তচর এনে হাজির করল এক রোমান মহিলাকে। টাটিয়াস ভুরুটুরু কুঁচকে ধমকে উঠলেন। গুপ্তচর বলল, এই মহিলা দুর্গে ঢোকার গোপন পথের হদিশ দিতে পারে। তবে একে কিছু পুরস্কার দিতে হবে।

হাঁফ ছেড়ে বাঁচলেন টাটিয়াস। হীরে জহরৎ-এর গয়নাটয়না উপহার দিয়ে দরকারী খবরটুকু জেনে নিলেন সেই রোমান মহিলার কাছ থেকে। তারপর রাতের অন্ধকারে শত্রুসৈন্য এগোল গোপন পথ ধরে। ওদিকে কিন্তু দেবতা জেনাস ছিলেন পাহারায়। দরজা পাহারা দেওয়ার সঙ্গে তাঁর আর একটা কাজ ছিল ঝর্ণার গতিপথ ঠিক করে দেওয়া। তিনি করলেন কি ফুটন্ত জলের তীব্র স্রোত বইয়ে দিলেন সেই পথে। টাটিয়াসের অভিযান সেখানেই শেষ। যেখান থেকে বেরিয়েছিল সেই ফুটন্ত জলের ধারা সেখানেই তৈরি হয়েছিল জেনাসের মন্দির।

গল্প শেষ হতেই টুনু বলল, এই জেনাসের নাম থেকেই কি এ মাসের নাম হয়েছে জানুয়ারি।

ঠিক তাই। রোমান সম্রাট নুমা পম্পিলাস যখন গ্রীক ক্যালেন্ডারের ১০টি মাসের সঙ্গে জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারিকেও জুড়েছিলেন তখনও বছর শুরু হতো মার্চ মাস থেকে। জুলিয়াস সীজার এই ক্যালেন্ডারকে আর একটু ঠিকঠাক করে জানুয়ারিকে করলেন বছরের প্রথম মাস। জেনাস ছিলেন রোমানদের দ্বারপাল দেবতা। আসা-যাওয়া, যে কোনোরকম নতুন উদ্যোগ সব কিছুরই দেবতা তিনি। যেহেতু জানুয়া নামটি এসেছে তাঁর নাম থেকে সেহেতু এটিই বছরের প্রথ মাস হওয়া উচিত।

টুনু হেসে বলল, কেমন ছিল এই জেনাসের চেহারা, নিশ্চয় পাহারাওলার মতো। মোটা-সোটা, ইয়া গোঁফ–

আমিও এবার হেসে ফেলি, না গোঁফ নেই তবে কোনে কোনো ছবিতে জেনাসের দাড়ি আছে। জেনাস হলেন রোগা সোগা এক বৃদ্ধ। তবে মাথা তাঁর দুটি।

দুটো মাথা! টুনু অবাক।

বললাম, বা রে পাহারা দিতে হবে না? একটা মাথা বাড়ি ভিতরটা দেখছে, অন্যটা লক্ষ্য রাখছে বাইরে। আর যে ে বাড়ির মধ্যে ঢুকতে এলে তাড়াতে হবে, তাই হাতে আে একটা লাঠি। জেনাসের প্রতীক চিহ্ন হলো চাবি,যা দিয়ে দরজ খোলাও যায় আবার বন্ধও করা যায়। রোমানরা প্রত্যে মাসের প্রথম দিনে জেনাসের পুজো করতো। বছরের প্রথ মাসের দেবতা হিসেবেও জেনাসের মূর্তি একেবারে ঠিক ঠিক

কি রকম।

দেখো, তাঁর এক মুখ ফেরানো রয়েছে পুরোনো বছরে দিকে অন্যটি নতুনের দিকে।

টুনু উচ্ছ্বসিত হয়ে বলল, বাঃ দারুণ।

এর চেয়েও একটা দারুণ ব্যাপার আছে। ব্রিটে 'ফার্স্টফুটিং' বলে একটা প্রথা চলে আসছে এখনও। এটা আ কিছুই নয়, নতুন বছরের প্রথম দিনটিতে বন্ধুবান্ধ আত্মীয়স্বজনের বাড়ি বাড়ি গিয়ে শুভেচ্ছা জানানো। ঐদি যদি কোনো কালো লোক এক টুকরো রুটি আর কয়লা হা কারুর বাড়ির প্রথম অতিথি হন, তাহলে বাড়ির মালিকে আর আনন্দের সীমা থাকে না। এটা নাকি সৌভাগ্যের লক্ষ

বি. সি. মজুমদার কর্তৃক নিউ বেঙ্গল প্রেস প্রাইভেট লিঃ, ৬৮ কলেজ স্ট্রীট, কলিকাতা হইতে মুদ্রিত
ও ১১ নং ঝামাপুকুর লেন, কলিকাতা হইতে শ্রী অরুণচন্দ্র মজুমদার কর্তৃক প্রকাশিত ও সম্পাদিত

ছুটির দিনের সাথী
সকাল থেকে উড়ছে ঘুড়ি চারটে, ছটা, আটটা,
হলদে সবুজ চাঁদিয়ালটা ওই দ্যাখো ভোকাট্টা!
ধরব বলে তাড়াতাড়ি উঠতে গেলাম গাছে,
হঠাৎ ডালের ঘষা লেগে কাটল হাঁটুর কাছে।
দেখলেই মা বকবে ভীষণ, ভয় তো কেবল তাই—
তার থেকে নয় আগেভাগেই বোরোলীন লাগাই।
বোরোলীন কাটাছড়া, ব্রণ, ফুসকুড়ি, ফাটা ও
শুকনো চামড়ার ইনফেকশন সারিয়ে তোলে।
বোরোলীনের অ্যান্টিসেপ্টিক গুণ ত্বককে
সুরক্ষিত রাখে।
বোরোলীন
সুরভিত অ্যান্টিসেপ্টিক ক্রীম
BOROLINE
ত্বকের নিয়মিত সুরক্ষার জন্য
সত্যিই কার্যকরী ক্রীম
এটি প্রসাধন সামগ্রী নয়
GD
জি ডি ফামাসিউটিক্যালস লিমিটেড
আশা মহল কলকাতা ৭০০০৫৩
Response 1003 R

Registration No. W.B./E.C.—60 December '86 "Suktara"

everest/86/PP/412-bn